অকথিত কাহিনী

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাণীশিল্প
১১৩/ই, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
এস. কে. মুখার্জ্জী
এস. বি. জানা
এ. এন. বেরা
ইউ. কে. হালদার
বাণীশিল্প
১১৩/ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

। উৎসর্গ ।

আমার প্রকাশকবন্ধুদের

হরপ্রসাদ মিত্র
'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—অধ্যাপক,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের নিবেদন

'লক্ষ্য করা' মানে এক নজরে দেখে নেওয়া শুধু,—নাকি বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখা?—কা'রও কণ্ঠস্বরে কী রকম মাধুর্য থাকলে তাকে 'মেগাফোন—বিনিন্দিত কণ্ঠ' বলা যাবে?—দাড়ি কামাবার ক্ষুরের বিজ্ঞাপন লেখবার চাকরি কোন্ পরিস্থিতিতে 'ক্ষুরধার পথ' হ'য়ে দাঁড়ায়?—ব্যাকরণের মাষ্টারমশাই কোন্ কোন্ বাস্তব অবস্থাবৈগুণ্যে 'কর্মধারয়' শব্দটা গীতার কর্মযোগের প্রতিধ্বনি মনে ক'রে পরমুহূর্তেই 'তদ্ধিত' কথাটাকে একটা সমাসের নাম মনে করেন?—অথবা সন্দেশের বিশেষণ 'উত্তম' কোন্ অবস্থায় 'উত্তমোত্তম' হ'য়ে পরিণামে 'সুচিত্রা' হ'য়ে যায়?—এসব অভাবনীয় জিজ্ঞাসার জবাব পেতে হ'লে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তীর বই পড়তেই হয়। এই 'অকথিত কাহিনী' সেই বই। এবং মানব-সংসারের গুরুতর সব গম্ভীর ব্যাপারে যাঁরা দায়িত্বের বোঝা বইতে—বইতে নির্জলা মিথ্যে কথাও তাঁদের মুখনিঃসৃত বেদবাক্য ব'লে চালাতে চান, তাদের পক্ষে কান্তাসম্মত উপদেশও এই 'অকথিত কাহিনী'—যার এক জায়গায় বলা হ'য়েছে—সব কথা প্রকাশ্য নয়,—কিছুকিছু কথা চাপবার যোগ্য, কিছু—বা ছাপবার যোগ্য! এবং 'জলচর দারোগাবাবুর' সতৃষ্ণ অবস্থা—অথবা "মস্তিষ্ক তো আমার কোনদিনই বর্ধমান নয়, বরং চব্বিশ-পরগণা—মেমরি ষ্টেশনই সেখানে নেই,"—অথবা 'মনোবৃত্তি' কথাটার বিশেষণ হিসেবে 'দুঃশোষণী' শব্দের প্রয়োগ, 'ক্ষয়রোগ' কথাটার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে লেখক হবার অধ্যবসায়কে 'অক্ষয়রোগ' বলা—এসব পরিস্থিতি ও প্রেরণার সরস পরিচিতিও এই 'অকথিত কাহিনী'!

বাল্য, কৈশোর, যৌবন পার হয়ে যাঁরা আমার মতন শিব্রাম-পরিবারের প্রৌঢ় স্বজন হ'য়ে আছেন অথবা আমার চেয়ে প্রবীণ যাঁরা,—যাঁরা কৈশোরে বা যৌবনেই আছেন এখনো,—আমরা যে যেখানেই আছি, শিবরাম চক্রবর্তীর ভক্ত হ'য়েই বাঁচি! এ সংসার স্বার্থের কাঁটাবন। মদমত্ত মাতঙ্গ বা পতঙ্গ যে সব

হোম্‌রা-চোম্‌রারা নিজেদের কোলে ঝোল টেনে টেনে উত্তরোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের মকর কুমীর রাঘব—বোয়াল হ'য়ে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত বা তৈলমসৃণ ক'রেছেন, তাঁদের মতন পুরস্কৃত প্রতিভা নয় শিবরামের; শিবরামের রচনার স্বাদ আলাদা—যাকে বলে অনির্বচনীয়,—যে আস্বাদনের গুণ বোঝাতে গেলে তাঁর এই 'অকথিত কাহিনী' থেকেই একটি উক্তি ধার নিঁয়ে ব'ল্‌তে হয়—"সেতারে সুর বাঁধা আর সন্দেশে তার বাঁধা যার তার কর্ম নয়।"

সারাজীবন তারিয়ে তারিয়ে যা পঠনীয়, সেরকম লঘু-ললিত, তীক্ষ্ণ-মসৃণ বাংলা রচনার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য এই শিব্রাম চক্কোত্তির রচনা। 'অকথিত কাহিনী'র প্রকাশক বন্ধুদের তাই নমস্কার জানাই।

হরপ্রসাদ মিত্র

অকথিত কাহিনী

সপ্তকাণ্ড শিব্রামায়ণ

সাত কাণ্ডে এই রামায়ণ-কাহিনী শেষ হবে কিনা গোড়াতেই তা হলফ করে বলা শক্ত। কেননা, আমার জীবদ্দশার মূলে অনেকের জীবনের শাখা-প্রশাখা এসে মিলেছে—সবারই যেমনটা হয়ে থাকে—সেই সব বিস্তার পত্র পুষ্পে পল্লবিত হয়ে, বিস্তৃত হয়ে, নানান কাণ্ডে—নানাজনের কাণ্ডে প্রকাণ্ড। তার মধ্যে যেগুলি নিছক হাসির, শুধু সেইগুলিই আমি বেছে নিয়েছি।

জীবনকে বোধহয় অখণ্ডরূপে দেখা যায় না। খণ্ড-ৎ-এর ন্যায় তাদের নানা খণ্ডে বিখণ্ডিত ভাবে আমরা পাই—সেই খণ্ড-ৎ গুলি জোড়া দিলে জীবনের অখণ্ডত্ব হয় কিনা জানিনে, তবে সেই খণ্ড-ৎ-কে ওল্টালে এক প্রশ্নচিহ্নকেই দেখতে পাই আর জীবন, শেষ পর্যন্ত বুঝি সেই প্রশ্নই থেকে যায়।

॥ এক ॥

ঘোড়দৌড়ের মাঠে একদা যে অচেনা ভদ্রলোকের দর্শন মিলেছিল তাঁর জীবনের খণ্ডচিত্র—খণ্ডচরিত্র নিয়ে এই কাহিনী।

পৃথিবীতে দুটিমাত্র race, হিউম্যান-রেস আর হর্স-রেস—রসিকজনের এই রসিকতাটা পুরনো। কেননা, এছাড়াও সুরের রেশ, সুরেশ ইত্যাদিরা রয়েছে।

হ্যাঁ, সুরেশ তো আছেই। রীতিমতই আছে।

সে-ই বললে, 'বাজে সময় নষ্ট করছ খালি। ঘোড়ার বই পড়ে ফর্মবিচার করে কি আর জেতবার ঘোড়া ধরা যায় হে? ঘোড়া তো নারীজাতি নয় যে চেহারা দেখিয়ে বাজি মারবে?'

'স্রেফ আনাড়ির মত কথা', জবাব দিল কানুনগো—'নেহাত ঘোড়ার পাতা অব্দি বিদ্যে না হলে নারীর সঙ্গে ঘোড়ার তুলনা—'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেসের মাঝখানে রেসকোর্সের রেস্তরাঁয় বসে লাঞ্চ করছিলাম তিনজন। তিনজনেই হেরেছি, তবে অশ্বহারে—গোহারা হয়নি। হেরে ঢোল হইনি তখনো। এই তবলচি অবস্থায় রয়েছি আর কি। তালে থাকার মতই। কাজেই সঙ্গত অসঙ্গতর কথা স্বভাবতই তখন উঠতে পারে।

তখনো ছিল কিছু সঙ্গতি। ট্যাকের সেটাকে বেশীক্ষণ ট্যাকসই রাখা যাবে না। কাজেই তা স্যাণ্ডউইচের পথে নিজের উপকণ্ঠ দিয়ে পাচার করবার তাল ছিল আমার।

'তুমি কি করে উইনার পাকড়াও শুনি?' আমি শুধালাম।

'খুব সহজে।' কানুনগো নিজের কায়দা-কানুন বাতলায়ঃ 'আমি করি কি, একজোড়া তাস নিই হাতে। তারপর প্যাকের ওপর থেকে উল্টে যাই তাস, একটার পর একটা, যতক্ষণ না একখানা টেক্কা আসে। তারপর টেক্কা পাবার পর একটা রেসকে ধরি—

ঘোড়ার নম্বর নিই—ঘোড়া আর তাস পর পর ফেলে যাই, একটার পর একটা, যতক্ষণ না ঘোড়ার নম্বর আর তাসের নম্বর মেলে। দুজনে এক নম্বরে এলেই সেই ঘোড়াটাকে বেছে রাখি। এমনি করে পর পর ছ'টা করে ঘোড়া বাছি প্রত্যেক বাজির। বেছে নিয়ে সেই ছ'টার নাম লিখি এক একটা কাগজে—আলাদা চিরকুটে। লিখে চিরকুটগুলো একটা ঠোঙার মধ্যে পুরি। পুরে নেড়ে চেড়ে ছুঁড়ে দিই আকাশে, তারপর একটা চোঙা দিয়ে ফুঁ দিই। হাওয়া লাগাই। উড়ন্ত চিরকুটগুলো ছিরকুট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। যেগুলি তার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে—'

'চিরকুটের আবার চিৎ উপুড় কি হে?' সুরেশ অবাক হয়।

প্রশ্নটা উচিত বলেই আমি মনে করি। কিন্তু মুখে কিছু বলি না। ওদের কথার মধ্যে আমার যা বলার তা আমি স্যাণ্ডউইচদেরই জানাই। সত্যি বলতে, তিনজনের মুখনাড়ার কাজ একলা আমাকেই তো চালাতে হচ্ছিল এধারে।

'মানে, যে চিরকুটগুলি নিজেদের নাম দেখায় আর কি! সেইগুলি তুলে নিয়ে সামনে রাখি—রেখে উঠে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে চোখ বুজি।'

'দুচোখ না এক চোখ?' জিজ্ঞেস করে সুরেশ।

'এক চোখ কেন? কোন মেয়েকে চোখ মারছিনে! ঘোড়ার দিকেই তাকাচ্ছি তো! না, এক চোখ নয়—'

অবাক হয়ে শোনে কানুনগো।

'সেণ্ট পারসেণ্ট চোখ বুজে একটা পেন্সিল ফেলি ওদের ওপর। পেন্সিল বা পেন্সিল-কাটা ছুরি যা পাই। তার মধ্যে যে স্লিপটা ছুরিকাবিদ্ধ হয়, যেটার ওপরে পেন্সিলের আঁচড় পড়ে—সেই ঘোড়াটাকেই আমি ধরি। আমার যা লাগাবার তাতেই লাগাই—উইন, প্লেস দো-তরফা।'

আমি বলি—'বাঃ বেশ। বহুৎ আচ্ছা।'

কানুনগো আর স্যাণ্ডউইচ উভয়কেই বলি—এক কথায়। আমার স্যাণ্ডউইচ-ক্র্যাফট চলতে থকে—ওদের অলক্ষ্যেই।

'তুমি কি করে ঘোড়া ধরো শুনি?' সুরেশ শুধোয় আমাকে।

আমি তিনটে প্লেট সাবড়েছি, তখন আর ঘোড়া ধরবার কোন বাধা আমার ছিল না। আমার রহস্য অবাধে আমি ফাঁস করি—'আমার তাস-টাস নয়। ছোরা-ছুরি না। আমার হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা। টস্ করি একটা টাকা নিয়ে। রাজার মুখে জিৎ আর উল্টোপিঠে হার—এই করে প্রত্যেক ঘোড়াকেই চান্স দিই একবার করে। এইভাবেই আমি ভাই, হার-জিৎ বাছি। ঘোড়া পাকড়াই।

'ফলং?' কানুনগোর জিজ্ঞাসা।

'ফলং নাস্তি।' আমি জানাই: 'একেবারে অশ্বডিম্ব। এইভাবে ঘোড়া ফলো করে দেখেছি কোনই ফলোদয় হয় না। প্রত্যেক ঘোড়াকেই একবার করে চান্স দিই—কিন্তু দিয়েও কোন ফায়দা নেই। বেশীর ভাগই তারা উল্টে পড়ে। মানে ঘোড়া নয়, সেই টাকাটাই। একই বেকায়দায় শেষ অব্দি আমার কোন ঘোড়াই ধরা হয় না আর—মাঠে এসেও।

'নাই যদি ধরবে তো আসো কেন মাঠে?' জিগ্যেস করে সুরেশ।

'খেলতে আসিনে, খেতে আসি। এখানকার রেস্তরাঁটা বেশ। স্যাণ্ডউইচগুলি খাসা। তবে এও আমি বলব, আমার ধারণাটা ভুল হয় না নেহাত। মাঠে এসেও তো দেখতে পাই, বাজির বেশির ভাগ ঘোড়াই ডিগবাজি খেয়েছে—আমার টসের মতই। দেখি যে আমার ন্যায় বেশির ভাগ লোকের টাকাই উল্টে পড়েছে। তবে কি না, নিজের ঘরের মধ্যে নয়—একেবারে বেহাতে গিয়ে। সে-টাকা বাঁচাবার কোন উপায় নেই আর—মারা পড়েছে বেঘোরে। আমার কি মনে হয় ভাই জান? অশ্বজাতি আর মনুষ্যজাতির মধ্যে রীতিমতন রেষারেষি আছে। অশ্বজাতি আমাদের স্বজাতির মত নয়। বাধ্য নয় আদৌ। রেসের মাঠে এলেই তার পরিচয় মেলে বেশ।'

'মাপ করবেন, এ-বিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিল।' পাশের টেবিল থেকে বেঁটেখাটো একটি লোক আমাদের-টেবিলে এসে বসল —'ঘোড়ার নির্ভুল খবর পাবার শুধু একটি মাত্রই উপায় আছে। সে হচ্ছে, ইংরেজীতে যাকে বলে নিউমারোলজি—তার সাহায্য নেওয়া।'

'কোন শক্ত ব্যায়রাম বুঝি? না না, সে তো নিউর‍্যালজিয়া।' শুধোবার সাথে সাথেই সুরেশ নিজেকে শুধরোয়।

'নিউ মার্কেটের টিপ বলছেন?' কানুনগোর জিজ্ঞাসা।

'নিউমারোলজি—সাদা বাংলায়, সংখ্যাতত্ত্ব।' বেঁটে ভদ্রলোক ব্যক্ত করেন।

'জানি। সাংখ্যদর্শন যার নাম।' আমি বললাম। সাংখ্যদর্শন যে কী বস্তু তা অবশ্য জানিনে, তাও আমি জানালাম।

'না না, সাংখ কেন, সংখ্যাই তো। সাংখ কেন বলছেন?' ভদ্রলোক বলেন: 'কথাটা তো সাংখ নয়, শঙ্খও না। আর যদি হতও, তাহলেও, শঙ্খের আবার তত্ত্ব কি? ওর তো শুধু ধ্বনি। শঙ্খনাদও বলতে পারেন। না মশাই, আমি নাদ-ফাদের কথা বলছিনে। আমার কথা হচ্ছে সংখ্যা। এক দুই তিন—এই সব সব সংখ্যা আছে—জানেন না?'

'বুঝেছি, অঙ্ক।' আমি ঘাড় নাড়ি, 'বলতে হবে না আর।' ভীত নেত্রে ভদ্রলোকের দিকে তাকাই।

অঙ্কে আমার ভারী ভয়। অঙ্ক মানেই আতঙ্ক। সংখ্যারা সব গোলমেলে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, এমনকি, পরীক্ষার বেলায়ও, অঙ্কের খাতায় গোল ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

অঙ্করা শুধু একবার মেলে জীবনে—অঙ্কশায়িনী এলেই। শূন্যযোগেও সংখ্যা হয় তখন। তুমিও শূন্যহাতে পৃথিবীতে এসেছ, তিনিও তাই, কিন্তু দুটি শূন্য হাত একটি মুঠোর মধ্যে এসে, এক পাণিগ্রহণে মিলে—মিলে মিশে—পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুটি শূন্য যোগ

করে এক হয়—কি করে কোন পাটীগণিতে হয়, জানিনে। তারপর এক হয়ে অসংখ্য হতে থাকে।

সকল অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের 'অধিষ্ঠাত্রী' তিনি এলেই সমস্ত মিলে যায়। সব আঁক পরাস্ত তাঁর কাছে, তাঁর চেয়ে বড় আঁকিয়ে আর নেই। সব আঁকুনিতেই তাঁর রং—আর, wrong কোনটাই নয়। দুয়ে দুয়ে চার না করে তার জায়গায় যদি বাইশ কর—পুত্র কন্যা সব জড়িয়ে—তাহলেও তা মিলেছে। সবাই এসে মিলে গেছে এক জায়গায়।

অদ্ভুত রহস্যই বলতে হয়। শূন্যরা মিলে এক হয়। এক থেকে অনেক। লক্ষ লক্ষ। একাদিক্রমে, কালক্রমে। এবং সব লক্ষ শেষে সেই কোটিতটেই এসে মেশে আবার। লক্ষ ভেদ করে ফের।

'সংখ্যাতত্ত্বটা বোঝাচ্ছি আপনাদের' ভদ্রলোকের আওয়াজে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়। সাংখ্যদর্শন সাঙ্গ হয় সংখ্যা-বর্ষণে।

'জিনিসটা আমি শিখেছি সবে কালকে। একজন সংখ্যাতাত্ত্বিকের কাছেই। এটাকে তিনি বিজ্ঞানের মত করেই ব্যাখ্যা করছিলেন। সংখ্যা-দর্শন না কি—বলছিলেন না আপনি—একটু আগেই? তা, এটাকে আপনি ইচ্ছে করলে দর্শন না বলে সংখ্যা-বিজ্ঞান বলতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'আপনার সেই সংখ্যাজনক ব্যাপারটি কী?' আমি শুধাই।

'শঙ্কাজনক নয় মোটেই—স্রেফ অদ্ভুত। সমস্তই আশ্চর্য রকমে মিলে যায় মশাই! সংখ্যা-বিজ্ঞানী কালকের সেই ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, একেবারে গোড়ার থেকেই শুরু করা যাক—আপনার জন্ম-তারিখটা বলুন তো! ১৯০৪ সালের ৯ই অগস্ট আমার জন্মদিন—আমি জানালাম। তিনি বললেন, বেশ। এবার ৯, ৮ আর ১৯০৪ সবগুলো লিখুন কাগজে। একটার নীচে একটা। এইবার সংখ্যাগুলি যোগ দিন। কী দাঁড়াল? একত্রিশ? এইবার একত্রিশের তিন আর এক যোগ করুন। দাঁড়াল—চার? এই চারই হচ্ছে আপনার জীবনের মূল রহস্য। মৌলিক সংখ্যা। সব কিছুর

নিয়ামক আপনার। আপনার ইহলোকের যা-কিছু তা সবই ঐ চারের ইঙ্গিতেই চলেছে। বললেন আমায় সেই ভদ্রলোক।'

'চারই আপনাকে নাচার করছে, বলেন কী!' সুরেশ সোচ্চার হয়।

'ঠিক তাই, অবাক কাণ্ড মশাই। আমার বিয়ে হয়েছিল তেরোই এপ্রিল। মিলিয়ে দেখলাম, তেরোর এক আর তিন মিলে দাঁড়ায় চার, আর এপ্রিল হচ্ছে বছরের চতুর্থ মাস। আমার বাড়ির নম্বর বাইশ। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার।'

'পিলে-চমকানো ব্যাপার দেখছি।' সুরেশ চমকায়।

'মারণ উচাটন বলে বোধ হচ্ছে আমার।' কানুনগো বলে।

চারের এই অনাচারে আমিও কম চমৎকৃত হই না—'অদ্ভুত তো মশাই, আপনার এই চারণ-মন্ত্র।' আমি বলি: '—মনে হচ্ছে আপনি চারণকবি মুকুন্দদাস—' আমার প্রচারণ।

'অদ্ভুত তো বটেই।' ভদ্রলোকের বিবৃতি চলে: 'আমার বড়ছেলের জন্ম হয়েছিল চৌঠো জানুয়ারী—কাঁটায় কাঁটায় চারটেয়। জানুয়ারীকে ত্রয়োদশ মাসও ধরা যায়। তেরো একুনে চার। আমার খুড়ো মারা যান ২২শে এপ্রিল—দুয়ে দুয়ে চার—আর এপ্রিল হচ্ছে চারের মাস। তাঁর উইল অনুসারে আমি চার হাজার টাকার মালিক হই। সেই টাকায় আমি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনি। ১৯৩০ মডেলের আট হর্স-পাওয়ারের গাড়ি। এখন মিলিয়ে দেখুন আপনারা—আট হর্স-পাওয়ার আসলে হচ্ছে দু-চার, আর ১৯৩০-এর যোগাযোগে দাঁড়ায় তেরো—তার পুনর্যোগে ফের আবার সেই চার।'

'গাড়িটা চলেছিল কদ্দিন?' আমার জিজ্ঞাস্য।

'মাস চারেকের বেশি না।' চার আঙুলে চাড়া দিয়ে তিনি জানান—'পরে জানা গেল, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয়, চার হাত ফেরতা গাড়ি।'

'অদ্ভুত তো!' চেঁচিয়ে ওঠে সুরেশ।

'ভুতুড়ে কাণ্ড।' সায় দেয় কানুনগো।

'চারই আমার সবকিছু চালাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম তখন। সেই সংখ্যাতাত্ত্বিকও সেই কথাই বললেন আমায়। বললেন, দেখতে পাচ্ছেন তো এখন, চার ছাড়া আপনার গতি নেই? চারই আপনার জীবনের চারা।—কথাটা তখন মেনে নিতে হল আমাকে।'

'দেখে-শুনে চার ফেলুন তাহলে।' সুরেশ বাতলায়: 'মাছ আপনার থেকেই ধরা দেবে।'

'চারিয়ে দিন আপনার জীবন।' আমি বললাম: 'চাড়া দিয়ে বাড়িয়ে তুলুন—গোঁফের মতই খাড়া করে তুলুন নিজের চারাটিকে।'

'তাই করতেই তো এসেছি মশাই।' জানালেন ভদ্রলোক: 'তাই তো এলাম আজ মাঠে। চার ফেলতে—এইখানেই।'

শুনে তিনজনেই আমরা উৎসাহিত হলাম। চার ইয়ারির দৌলতে আমাদের ত্র্যহস্পর্শের দোষটা কেটে যায় যদি। হারের বাজি উলটে যদি উপহার হয়ে দাঁড়ায়।

'ভালই করেছেন। আজ আবার দোসরা নভেম্বর—দেখেছেন তো আজকের তারিখটা? দিনের দুই আর মাসের এগারো—মিলে তেরো, পুনর্মিলনে চার।' ব্যাপারটায় আমিও একটু চাড় দেখাই এবার।

'তাই দেখেই তো আসা মশাই। সেইজন্যেই তো আশা। এ যোগাযোগ আমি বিফল হতে দেব না।' তিনি বললেন: 'চার নম্বরের বাজিতে চার নম্বরের ঘোড়া ধরব আজ। যথাসর্বস্ব—পুঁজিপাটা যা ছিল আমার—এমন কি সেই ফোর্থহ্যাণ্ড গাড়িটা বেচেও যা পেলাম—সব নিয়ে এসেছি। সমস্ত লাগাব। মোটমাট চারহাজার টাকা—দু-হাজার উইন—দু-হাজার প্লেস।'

'একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়বেন তাহলে, অ্যাঁ?' আমার চোখ কপালে ওঠে—'চূড়ান্ত কিংবা চারান্ত—যাই বলুন?'

তিনি বলেন—'হ্যাঁ।' নিজের উত্তরীয়টা গলায় জড়িয়ে পাক দিয়ে তাঁর উত্তরদান। পাক খেয়ে তাঁর উত্তরীয়টা ঠিক চারের মতই ঠেকছিল আমার চোখে।

তিন নম্বরের বাজিটা আড্ডাবাজিতেই কেটে গেছল আমাদের। চতুর্থ দৌড়ের ঘণ্টা পড়তেই উঠে গেলেন ভদ্রলোক। বাজতে না বাজতেই।

আমার দুই বন্ধু নিজেদের জন্মতারিখ নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেল। কষাকষি করে দেখবে কোন্ বাজির কত নম্বর ঘোড়া অব্যর্থভাবে ধরা যায়। অঙ্কের যোগাযোগে যোগ্যতার দিক দিয়ে কোন্ ঘোড়া একাধারে অশ্বমেধ আর রাজসূয়। রাজা করে দেবে একচোটে।

নিজের জন্মদিন আমার জানা নেই। জন্মেছি কিনা সেইখানেই ঘোর সংশয়। অগত্যা সেই ঘোরালো সমস্যায় না গিয়ে আরেক প্লেট স্যাণ্ডউইচ নিয়ে তারই যোগ-বিয়োগ করতে লাগলাম আমি।

রেস শেষ হল। অনেকের রেস্ত শেষ হল। আমিও রেস্তরাঁ ছাড়লাম। কানুনগো আর সুরেশ তো আগেই কেটেছিল। কারো টিকির দেখা নেই। বেরনোর ভিড়ে সঙ্গীদের পাত্তা পাওয়া দায়। কোথায় সুরেশ, কোথায় বা কানুনগো!

গোরু-খোঁজা খুঁজছি, এমন সময়ে গেটের মুখে সেই ভদ্রলোকের সাথে মুলাকাৎ। 'কী মশাই, জিতেছেন তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি—'বেশ মোটামুটি রকম? কী বলেন?'

'আজ্ঞে না মশাই!' ম্লানমুখে তিনি উচ্চারণ করলেন।—'চার নম্বরে এল কিনা ঘোড়াটা।'

চার ফেলে নাচার হয়েছেন ভদ্রলোক!

॥ দুই ॥

লেখক বলে বিজ্ঞাপিত হবার আগে আমাকে বিজ্ঞাপনের লেখক হতে হয়েছিল। এটি আমার জীবনের সেই অংশের একটি পর্ব।

কাহিনীটার গোড়ায় মুখবন্ধের মত একটুখানি দরকার। বস্তুতঃ লেখামাত্রই তো বিজ্ঞাপন—লেখকের নিজের। তাঁর জীবনের নানান কাণ্ড নানা বাহাদুরি, ভালোবাসা পাওয়া না পাওয়ার যতো দুর্ভোগের

বৃত্তান্ত—বিভিন্ন নায়ক নায়িকার নামের ছলনায় ইনিয়ে বিনিয়ে,—সেদিক দিয়ে ধরলে প্রত্যেক লেখকই বিজ্ঞাপনলেখক, নিজের বিজ্ঞাপনদাতা।

কিন্তু এটি ঠিক সে রকমের নয়। শ্রী নিয়ে শুরু হলেও শেষপর্যন্ত ভারী বিশ্রী ব্যাপার।

টুকটাক লিখি তখন—ছোটদের পত্রিকায়—রামধনু আর মৌচাকে, মোটামুটি পাঁচ দশটাকা মিলে যায়।

সেইকালে হঠাৎ একদিন শ্রীঘৃত-র সম্পর্কে একটি স্তুতিবাক্য মনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল হঠাৎ। 'বাজারে দুই প্রকারের ঘি—শ্রী এবং বিশ্রী—কোনটি আপনার পছন্দ?' বিজ্ঞাপনের শ্লোগান হিসেবে নেহাৎ মন্দ নয়, এবং প্রায় গানের মতই মর্মভেদী, গুলির মতই লক্ষ্যভেদকারী।

এইটাই প্রস্তুতিপর্ব।

বাক্যটা ছত্রাকারে গজাতেই ওটা একটা খামের ভেতর পুরে কটন স্ট্রীটের ঘি-ছত্রে, শ্রীঘৃতের মালিক শ্রীঅশোক রক্ষিত মশায়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম—তিনিই ওখানকার ছত্রপতি, এই ধরনের একটা আন্দাজ ছিল।

কয়েকদিন পরে ডাকে একখানা চেক এলো—একশ টাকার চেক। আর সেই সঙ্গে তাঁর ডাক।

ডাকে সাড়া দিলাম। গেলাম তাঁর কাছে।

টাকা তো দিয়েছেনই, সেই সঙ্গে তিনি একটিন শ্রী-ঘি উপহার দিতে চাইলেন।

তাঁর ওই ঘৃতদান আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি। ঐ চেকটাই ঢের। তার ওপর ফের কেন? ঘি নিয়ে আমি করব কি মশাই? আমার কি বাড়িঘর পরিবারবর্গ আছে? থাকি তো একটা মেসে। সেখানে ঐ ঘিয়ের টিন ঘাড়ে নিয়ে হাজির হলে হুলুস্থুল পড়ে যাবে। তারপর বিনে পয়সায় ঐ ঘি ঢালাও খেয়ে পেটের অসুখ হয়ে যাবে

সকলের। স্বজাতি ঠিক না হলেও আমার স্বজাতি মনুষ্যকল্প অনেকের পেটেই ত ঘি তেমন সয় না। তখন তারা সবাই মিলে মেরে ধরে বাসার থেকে তাড়িয়ে দিক আমায়। বাস্তহারা হই আর কি!

তাই ঘি-টা আর নিইনি। তখন কি আর জানি, (ঘি-না-খাওয়া মগজে ঘিলুজাতীয় কিছু ছিল না নিশ্চয় তখন) যে ঐ ঘি ঘাড়ে করে না বয়ে পাশের দোকানে সস্তাদরে বেচে দিলেও অন্ততঃ আরো শ'খানেক টাকা (সেকালে ঘি-এর দর কত ছিল কে জানে!) কি আর না আসতো!

এরপরই সেই বিজ্ঞাপনের পরতায় আমার পরবর্তী পর্বটা শুরু। এর চেয়েও শোচনীয় আরেকটি পর্ব তার পরেই আসছে। আর তার পরই আমার ঘাড় থেকে বিজ্ঞাপনের এই নিদারুণ গন্ধমাদন নেমে গেল তার থেকে দারিদ্র্য মোচনের বিশল্যকরণী আর হাতে এল না আমার।…

দক্ষিণার আমদানি লেখকজীবনে দক্ষিণের হাওয়ার মতই বিরল। আর, তেমনই মৃদুমন্দ। মন্দার বাজারে সম্পাদকের দাক্ষিণ্য মন্দীভূত আরো। তাই মনে করলাম—

মনে কিছুই করিনি, এক ব্যবসাদার—নামজাদা বালতির ব্যাপারী—প্রচারসচিব চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম। তখন মনে পড়লো, একদা…

'শ্রী আর বিশ্রী—বাজারে দুই প্রকারের ঘি। কোনটি আপনার পছন্দ?' ক দেখে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ন্যায় প্রহ্লাদী প্রেরণায়, ঘিয়ের নামে শ্রীকার দেখে ঐ লাইনটি মনে এসে গেছল হঠাৎ! এসে, কিছুতেই আর যেতে চায় না মন থেকে। প্রথম গজানো প্রেম আর গোঁফের মতই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। কথাটার কী গতি করি ঠিক করতে না পেরে শ্রী ঘৃতের ঠিকানাতেই ওটাকে পাঠিয়ে দিলাম একদিন—তেমন কিছু না ভেবেই।

পাঠিয়ে ভুলে গেছি। কিন্তু…

অযাচিত পাঠানোর কিছুদিন পরেই অভাবিত এক চেক এসে হাজির—এক ক্রস চেক—ক্রস স্ট্রীটের আড়ত থেকে। একটি লাইন লেখার জন্য একশো টাকার বেশি পেয়েছিলাম, মনে আছে আমার। শ্রীযুত ঘিয়ের কর্তাদের ধন্যবাদ-জড়িত নগদ অনুপ্রেরণা, ভাবতে বেশ লাগে এখন। ভাবলে আবেশ আসে এখনো!

লেখকজীবনের সেই উঠতি বয়েস। একশো টাকায় তখন বইয়ের কপিরাইট বেচি, আর পাঁচহাজার লাইনের কমে কি কোনো বই? প্রুফ দেখতে দিলে বাড়ে আরো, আরো ইমপ্রুভ করি—লেখার দিকে না হলেও লাইনের দিকে তো নিশ্চয়ই।

সেই সময় এক লাইন লিখে একশো টাকা পাওয়া—এবং নিজের লেখার লাইনে নয়—আনকোরা আলাদা গলিতে—ভুলতে পারি কি কখনো? আমার রচনার সম্পাদকদুর্লভ সেই সমাদরে, বলতে কি ঘিয়ের মতই আমি গলে গিয়েছিলাম সেদিন।

তাই মনে করলাম এই লাইনেও—এই এক আধ লাইনেও তো আমার বেশ আসে। প্রচারসচিবের কাজটা নেবার বাধা কী তবে? লেখার এই নতুন লাইনটাই নিলাম না হয়? ধরতে গেলে লেখকজীবন থেকে একেবারে ডিরেলমেণ্ট তো হচ্ছে না?

পাঠিয়ে দিলাম আবেদন। শ্রী-ঘৃত-কীর্তির উল্লেখ করতেও দ্বিধা করলাম না।...

চিঠি রওনা করার দিনকয়েক পরেই জবাব এলো। ডাক পড়েছে আমার। গেলাম মুলাকাৎ দিতে—

'দেখুন আবেদন জানিয়েছেন যে আপনি একজন লেখক,' শুরু করলেন দশাসই সেই ভদ্রলোক, 'কিন্তু আপনার লেখার কোনই পরিচয় দেননি। কী লেখেন আপনি? সাইনবোর্ড? মনি অর্ডার ফরম্? না হিসেবের খাতা?'

'আজ্ঞে না। গল্পটল্প লিখি। বইটই।' সলজ্জভাবে জানালাম।

'কিন্তু মশাই, বই তো নয়, বিজ্ঞাপন লেখার কাজ যে। দায়িত্বপূর্ণ

—বেশ শক্ত কাজ।' তিনি বলেন—'আরো অনেক আবেদন এসেছে। সবাই নমুনাস্বরূপ কিছু না কিছু বিজ্ঞাপনের কপি লিখে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার চিঠির সঙ্গে তেমন কিছু তো নেই।'

ইচ্ছে হলো যে বলি স্বয়ং কপিকলই যখন হাজির তখন বলুন না, কী কপি, কতো কপি চাই আপনার? কিন্তু ওভাবে না বলে ভাবটাকে ভাষান্তরিত করে দিই—'কপি লিখতে কতোক্ষণ মশাই? লেখাই তো আমাদের পেশা।'

'শ্রীঘৃতের ওটা কি আপনার সত্য ঘটনা?' উনি জিজ্ঞেস করলেন।—'বিলকুল নিজস্ব? মানে, একেবারে অরিজিনাল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেখুন, শ'খানেক আবেদনের মধ্যে শ'পাঁচেক বিজ্ঞাপনের কপি পেয়েছি। লক্ষ্য করে দেখলাম—অবশ্যি ওপর ওপর—একটাও সুবিধের নয়। আমি চাই একেবারে অন্যরকমের। নতুন ধরনের এমন কিছু যা সহজেই সবার নজরে পড়বে—লোকের আলোচ্য হয়ে উঠবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।'

'তাইতো হওয়া উচিত মশাই। যাতে আপনার বিজ্ঞাপনে সবার চোখ পড়ে—আপনার বালতির ওপর ঝোঁক পড়ে সবাইকার'—বলতে যাই আমি।

'গতানুগতিক—যেমন সবাই বিজ্ঞাপন দেয়—তেমনটি আমার চাইনে। আমি চাই নূতন আইডিয়া।'

'যা বলেছেন। ঐ নতুন আইডিয়ার কথাই আমি বলছিলাম।' আমি বললাম—'বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

'কী রকমটা শুনি?' তিনি শুধান।

সত্যি বলতে, কোনো আইডিয়াই আগের থেকে ঘাড়ে করে আমি যাইনি। আইডিয়াটা তক্ষুণি গজালো ওঁর কথায়। ওঁর এই গজালির মাথায় গেঁজে গজগজ করে উঠলো আমার মগজে। জুতোর পেরেকের মতই খচখচ করে উঠলো ঘিলুর পাদপীঠে।

আমার আইডিয়াগুলো ঐ রকমই। আগের থেকে গাদা হয়ে থাকে না, অকারণ এসে গঞ্জনা দেয় না—তাগাদার সময় দরকার মাফিক গজিয়ে ওঠে। মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফূর্ত হয়। যখন আসে, বিদ্যুৎ-চমকের মতই আসে, আমার মাথার আকাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে খেলে যায়। চমকিত করে তোলে আমায়···আমার আইডিয়ারা। চমৎকৃত করে, কিন্তু চিকুরের ন্যায় কখন আসে কীভাবে আসে কেন আসে···আমি তার কোন আইডিয়াই পাই না।

'শুনি আপনার আইডিয়াটা একবার?'

'এইমাত্র আপনি একটা কথা বললেন—সত্য ঘটনা।' আমি বললাম···'বললেন না?'

'হ্যাঁ, বলেছি।' তিনি স্বীকার করলেন।

'ঘটনা কাকে বলে?' আমি জিগ্যেস করি।

তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'কেন, ঘটনা যা ঘটেছে তাই তো ঘটনা?' তিনি জানান···'আমি তো তাই জানি মশাই!'

'ঠিক তাই।' আমি সায় দিলাম···'তাহলে দেখুন, 'সত্য ঘটনা' কথাটা বিলকুল ভুল। সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বাংলা। ঘটনা মানেই তো সত্য, তার ওপরে আরো সত্য চাপানো অনাবশ্যক। নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। তাই নয় কি?'

মানতে হোলো তাঁকে। ঘাড় নাড়লেন তিনি···একটু যেন বিমর্ষ ভাবেই

'তারপরে দেখুন, আপনি বললেন যে বিজ্ঞাপনের কপিগুলি আপনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মানে হচ্ছে মন দিয়ে দেখা। যত্ন নিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখা···খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওপর ওপর চোখ বোলানো আর লক্ষ্য করা এক জিনিস নয়।'

তক্ষুণি উঠে তিনি অভিধান পড়িলেন···খোঁজ নিলেন কথাটার। খুঁজে পেতে যখন দেখলেন যে আমার কথাই খাঁটি তখন কে যেন তাঁকে চাঁটি মারলো। মোটেই খুশি দেখা গেল না তাঁকে। কোনো

উত্তর না দিয়ে শুধু উত্তর-দক্ষিণ ঘাড় নাড়লেন তিনি রীতিমতন গম্ভীর হয়ে।

'এখন, আমার কথা এই, আমরা বাঙালীরা হচ্ছি ভাষাগর্বিত জাত। সবকিছুই আমাদের ভাষা ভাষা। 'মোদের গরব মোদের আশা · আ-মরি বাঙলা ভাষা।' শুনেছেন নিশ্চয়ই বেতারে? শোনেন নি? মনের সেতারের সঙ্গে সেই সুর গাঁথা আমাদের'...কথাটাকে আমি ভালো করে তারিয়ে নিই চারিয়ে দেবার আগে...'যদি কোনো বাঙালীকে মুখের ওপর বলা হয় তুমি ইতিহাস জানো না, ভুগোল জানো না, বীজগণিত জানো না, প্রত্নতত্ত্ব কি পুরাতত্ত্ব জানা নেই তোমার, তাহলে সে মোটেই কিছু মনে করবে না, মেনে নেবে অম্লানে, কিন্তু যদি তাকে বলি, মশাই আপনি বাঙলা জানেন না অমনি তার মনে গিয়ে লাগবে। মানে লাগবে। সারাদিন মন ভার হয়ে থাকবে তার।...'

'তা ঠিক।' নিজের মনোভার তিনি মোচন করলেন। বেশ ভারিক্কি ভাবেই। 'এখন, বিজ্ঞাপনের মোদ্দা কথাই হচ্ছে, লোকের মনে লাগানো। যাতে কথাটা ঘুরে ফিরেই তার মনে আসে, কিছুতেই সে না ভোলে, ভুলতে না পারে। তাই নয় কি? আমার বিজ্ঞাপনের ধারাটা হবে এই ধরনের ভাষার যতো খুঁত ধরে। সারাদিনের কথাবার্তায় সাধারণের যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে সেইসব দেখিয়ে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ—'আমি দেখাতে শুরু করি :

'সত্য ঘটনা কথাটা কি ঠিক? না মশাই, আদৌ না। যখন আপনি সত্য ঘটনার কথা তোলেন, বলতে আমি বাধ্য, যারপরনাই ভুল করেন আপনি। ঘটনা, সত্য বলেই তো ঘটনা; তা না হলে তো তা কিছুতেই ঘটনা হতে পারত না। আপনি কি মিথ্যা ঘটনার কথা শুনেছেন কখনো? ইত্যাকারে শুরু করে একজন নামজাদা লেখকের ছবি দেব আমাদের বিজ্ঞাপনের সাথে—ইনি একজন বড় লেখক, তার কারণ এঁর লেখার প্রত্যেকটি কথা সুনির্বাচিত। আপনি যেমন টাকা বাজিয়ে নেন, ইনি তেমনি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বাজিয়ে

তারপরে তা ব্যবহার করেন। তেমনি আমাদের বালতির বেলাতেও, তা বাজে কিনা, বাজারের আরো দশটা বালতির সঙ্গে বাজিয়ে দেখে তবে আপনি নেবেন।'

কথাটা ভদ্রলোকের মনে লাগে। প্রাণে বাজে। এতক্ষণে তাঁর মুখের গুমোট কেটে গিয়ে কিছু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। নাতি-ক্ষীণ রেখার মতই, তাঁর গোঁফের দুধারে। ভার ভার মুখের মেঘলার ধার ধার রূপালী হয়ে ওঠে।

'এ ধরনের বিজ্ঞাপন, দেখবেন, দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়বে দেখতে না দেখতে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে মানুষের মনে মনে। আপনার বালতি কাটবে হু হু করে—বালতি বালতি টাকা ঘরে তুলবেন আপনি।'

'তার এক বালতি আপনার।' তিনি সহাস্যবদনে বর দিলেন আমায়—'বেশ, তাহলে স্থুরু করে দিন। লেগে যান আজ থেকেই।'

দিলাম শুরু করে। তিন মাসের মতন খোরাক তৈরি হয়ে গেল গোড়াতেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। কাজটা শক্ত ছিল না আদপেই। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বেয়াদপি—ভাষার এত রকমের গলতি বাঙালীর গলা দিয়ে গলে যে—চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এত অযথা কথা, অযথার্থ বাক্য আমার ব্যাভার করি—একটু তালে থাকলেই তার তালিকা মেলে। তেরটা কপি বানিয়ে ফেললাম আমাদের ভাষা-তারল্যের—মায় লে-আউট সমেত। তের হপ্তায় তের রকমের ব্যঞ্জনা—হপ্তায় হপ্তায় পালটাবার বিজ্ঞাপন। তের হপ্তার পরে ফিরতি আবার সেই তেরস্পর্শ—পরের পর। পূর্ণগ্রহণের পুনঃগ্রহণ।…শুরু হয়ে গেল সেই সপ্তাহ থেকেই।

বিজ্ঞাপনটা হৈ-চৈ তুললো বেরুতে না বেরুতেই—প্রথম দিনেই টের পেলাম। বসে আছি ট্রাম গাড়িতে, কানে এলো আমার—একজন বলছে অপর জনকে—'আমি ভাই জানতুমই না। আশ্চয্যি। লক্ষ্য করা মানে একটু তাকানো—এক পলক মাত্র—য্যাদ্দিন এই ভেবেছি…'

'আমিও তাই।'

বিজ্ঞাপনটা এদের লক্ষীভূত হয়েছে দেখছি। আরো অনেকে এটা লক্ষ্য করেছে নজরে পড়লো আমার। বাড়ি ফিরতি বাসের একজনকে তো উচ্চকণ্ঠেই সাবাস দিতে শোনা গেল। এমন ধারার বিজ্ঞাপন আর কখনো নাকি বেরোয়নি আমাদের দেশে। সকলেই বেশ লক্ষ্য-সচেতন হয়ে উঠেছেন একদিনেই দেখলাম।

পাড়ার রেস্তরাঁয় বসে চায়ের ফাঁকে ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়লো আনন্দবাজারের পাতার থেকেও লক্ষ্যস্থলটাই উধাও! কে যেন বেমালুম কেটে নিয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপনটা তাহলে লক্ষ্যভেদ করেছে, বলতে হবে।

তিন হপ্তায় সারাদেশে সোরগোল পড়ে গেল—সত্যিই! আপিসে যাই আসি সেখানে ঘণ্টাখানেকের মামলা আমার। প্রতি হপ্তার কপি রওনা করে দেওয়া খবরের কাগজের আপিস থেকে লে-আউটটা কম্পোজ হয়ে এলে তার প্রুফ দেখা, ভুল শুদ্ধ করা, কখনো বা এক আধটু শুধরানো। এই তো কাজ। কর্তার সাথে মুলাকাতের দরকারই হয় না, আছি বেশ।

কিন্তু দরকার হলো হঠাৎ। চতুর্থ সপ্তাহের গোড়ায় আপিসে গিয়েই টেবিলের ওপরে একটা চিঠি পেলাম—কর্তার স্বাক্ষরিত—সঙ্গে একখানা চেক:

'এতদ্বারা আপনার একমাসের বেতন অগ্রিম দিয়া আপনাকে বরখাস্ত করা হইল। আজ হইতে আপনার কাজের আমাদের আর কোনই প্রয়োজন নাই। ইতি—ভবদীয় ইত্যাদি...'

এর মানে? গেলাম কর্তার কাছে। ঘরের মধ্যে না আমাকে দেখেই তিনি চোখ পাকালেন। তাঁর দুধারের রগ ফুলে উঠলো দেখতে না দেখতে—রগান্বিত হয়ে সারামুখ লাল হয়ে উঠলো কি রকম—রাগান্বিত হয়েও হতে পারে হয়তো।

'গেটাউট—গেটাউট।' ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক—'ঢের হয়েছে। আপনাকে আমাদের চাইনে।'

বালতি-সম্রাটকে এমন কথা বলতে শুনবো, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।—'এর মানে কী, আমি জানতে চাই।' আমি শুধাই।

'এর মানে? এর মানে, আমার অনেক টাকা জলে গেছে, আর নয়। গেটাউট।'

মূলধনী-সুলভ, দুঃশোষনী মনোবৃত্তি, বুঝতে আমার দেরী হয় না। আমার প্রচারকাজের সাহায্যে নিজের সুবিধে করে নিয়ে, যতো রাজ্যের পচা বালতি বাজারে পাচার করে অধুনা টাকার কাঁড়িতে বসে—এখন পূর্বপ্রতিশ্রুত এক বালতি টাকা দেবার বেলায় তার বদলে আমার মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়া। তাছাড়া আবার কী? নিপাতনে সিদ্ধিলাভ বলে থাকে। এখানে সিদ্ধিলাভের পরে এই নিপাতন।

কিন্তু আমিও কৈফিয়ৎ না নিয়ে নড়বার নই। গেটাউট, কিন্তু কেন গেট আউট? এরকম অকথ্য-ভাষনের সন্ধি-বিচ্ছেদে বাঙলা বৈয়াকরণিক নিয়ম-লঙ্ঘনের কথা না হয় নাই তুললাম—সেসব 'স্খলন পতন ত্রুটি' না ধরেও এরূপ অনুচিত কথনের অর্থ কী? সাদা বাঙলায় সোজাসুজি জানতে চাই।

'আপনাকে আমাদের চাইনে। সাদা কথা। সোজা কথা।'

'হায়, আপনি কী হারাতে যাচ্ছেন, আপনি জানেন না। বিজ্ঞ লোকের একান্ত আপন যে বিজ্ঞাপন, তার মৌলিক কারুকলাই আপনি হারাতে বসেছেন। সেই সুদুর্লভ বিজ্ঞাপনী-প্রতিভাকেই দূর দূর করে দিচ্ছেন। সপ্রতিভভাবেই বলতে যাই কথাটা—গুচ্ছের কথা হলেও গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

'গেটাউট। বাইরে গেট আছে, সেই গেট দিয়ে আউট হয়ে যাও। গেটাউট।' আমিও যেমন নাছোড়, উনিও তেমনি বান্দা।

২

কথার প্যাঁচে পেছোবার নন। আমার যেমন না-ছাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা, তাঁরও তেমনি আমাকে তাড়ানোর pun-ান্ত প্রয়াস।

কিন্তু হট বললেই কি হটবো? সেই ছেলেই কি আমি? চট্ করে কি হটবার? এমন কি, চটবারও নই সহজে। এক বালতি টাকা পাবার আবাল্য স্বপ্ন আমার—তা কি ওঁর এক কথায় জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবো এখান থেকে? অমনি অমনি? ওর মুখের কথায়? মুখের কথায় মুখ্য কথাটার জলাঞ্জলি হবে?

'কেন, আমার প্রচার কাজে কি কোনোই ফল হয়নি? হাজার হাজার লোকের নজরে পড়েনি আপনার বিজ্ঞাপন? হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষগোচর হয়েছে, আমার নিজের স্বচক্ষে দেখা। বলুন—একি সত্য ঘটনা নয়?' অশুদ্ধ সত্য কথাটাও আমার মুখ থেকে ফস্‌কায়।

'সত্যিকার এক দুর্ঘটনা, বলছি তো।' তিনি বলেন: 'হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ আমার। আমারো পরের স্বচক্ষে দেখা নয়।'

'পরের স্বচক্ষে' দেখাটা যে নিজের স্বচক্ষে দর্শনের মতই অপপ্রয়োগ সেটা আর পরস্পরের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে যাই না। নিজের আপাতঃ দর্শনের স্থির লক্ষ্যে অবিচল থাকি এবং বলি যে,

'হাজার হাজার বালতি কাটেনি আপনার? লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়নি আমার বিজ্ঞাপনে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে বটে—ঐ বিজ্ঞাপনেই হয়েছে—' অবশেষে তিনি মেনে নেন,'—কিন্তু—কিন্তু—'

তিনি একটুখানি কিন্তু-কিন্তু হতেই আমি গর্জে উঠি—'তবে—তবে?'

'হ্যাঁ, হাজার হাজার কেটে যাবার খবর আমি পেয়েছি। এমন কি পচা ছেঁড়া উইয়ে খাওয়া একটাও পড়ে নেই আর—তাও ঠিক...'

'হয়েছে তো? তবে?' আমার বিজয়োল্লাস দেখা দেয়।—পচা পর্যন্ত পাচার হয়ে গেছে। 'তবে কী?'

'তবে বালতি নয়, অভিধান। অভিধান।' শিবের গীতে তিনি অভিধান আনেন। জানেন।— 'বাজারে অভিধানের কাটতি হয়েছে হাজারে হাজারে।······এখন, দয়া করে—গেটাউট।'

গেটআউট হয়ে এক গেট দিয়ে না বেরুতেই আরেক গেট খুলে যায় আমার সামনে।

কোনোদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, মন মেজাজ খিচ্‌ড়ে ছিল বেজায়।

'ও কর্তা! শুনছেন!' পিছন থেকে হাঁক পাড়ে কে। ভারী বেয়াড়া আওয়াজ।

পিছন ফিরে দেখি—হ্যাঁ, বেয়ারাই বটে! কিন্তু আমাকে ডাকছে না নিশ্চয়। কেননা আমি কোন কর্তা নই। কোথাও কোনো কর্তৃত্ব নেই আমার। কর্ম-পদীয় করণ হতে পারি, কারণও হতে পারি, কর্মের। কিন্তু সে কর্মও সম্প্রতি আমার চুকে গেছে, এপাড়ায় এখন আমি নিতান্তই অকারণ।

দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে যাই।

বেয়ারাটা দৌড়ে আসে আমার পিছনে।—'আমাদের কর্তা ডাকছেন আপনাকে।'

'তোমাদের কর্তা? কেন বল তো! কারণ?'

'কারণ তিনিই জানেন। তবে বোধ হচ্ছে আপনাকে তিনি কোনো কর্ম দিবেন।'

কর্ম? তা, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম যখন, তিনি তো দিতেই পারেন ইচ্ছে করলে। আমার এই নিত্য অভাববাচ্য অবস্থায় কোনো কর্তৃবাচ্যের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। যেতেই হয় বাধ্য হয়ে।—'কী নাম তোমাদের কর্তার? যেতে যেতে শুধাই।

'শেখ দিলওয়াস্তা সাহেব। ভারী নামডাক। কারবারী লোক। শোনেননি নাম?'

'কিসের কারবার তাঁর?'

'হাজার রকমের। সন্দেশের—ক্ষুরের—'

সন্দেশের উচ্চারণে উৎসাহ পাই। কোনো সন্দেহ না করে ক্ষুরধার পথে পা বাড়াই।

'বালতিওয়ালাদের কাজটা আপনি ছেড়ে দিয়েছেন?' দিলওয়াস্তা সাহেব শুধালেন আমায়।

'না। ছেড়ে দিইনি ঠিক। ছাড়িত হয়েছি বলা যায়।'

'একই কথা। তাহলেও আমাদের কাজ নেবার আপনার কোনো বাধা নেই আর?'

'কাজটা কী আপনাদের বলুন দেখি?' আমি জানতে চাই।

'সেই একই কাজ—আমাদের এখানেও। ঐ পাবলিসিটির কাজই।'

'কিসের কারবার, জানতে পারি কি?'

'সন্দেশের, দাড়ি কামানো ব্লেডের, হলো গ্রাউণ্ড ক্ষুরের, বিস্কুট লজেন্স—আরো হরেক রকম চীজের বিজনেস।'

'সন্দেশের আমি ভক্ত। যদি আমায় দিতে চান তো তার পাবলিসিটির ভার দিন। সন্দেশের প্রশংসা আমি মুক্তকণ্ঠে করতে পারি।'

'কিন্তু মুক্তকণ্ঠে করলে তো হবে না। বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলাবাজির কাজ তো নয়। লেখালেখির কাজ যে মশাই। বিজ্ঞাপন রচনার কাজ।'

'লেখালেখির কাজই তো আমার—জানেন না বুঝি? বিশেষ করে বলতে হবে না। সে বিষয়ে আমি মুক্তহস্ত।'

'তাহলে চলুন, আমাদের আপিসগুলো ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে আনি আপনাকে। টেস্ট করে দেখুন, যেটা আপনার মনে ধরে……'

'সন্দেশের কাজটাই আমার পছন্দসই।' আমি কই, 'সেইখানেই চলুন সব আগে।' সন্দেশকেই আমি সর্বপ্রথম কর্তব্য জ্ঞান করি।

নিয়ে গেলেন ওঁর সন্দেশের দোকানে। নয়া ছাঁচের আনকোরা চেহারার সরেস যত সন্দেশ।

সন্দেশের বিচিত্র রূপ দেখে আমি তো চিত্রার্পিত। চোখের সম্মুখে যেন সম্মোহন।

স্বাদেও তেমনি অনুপম হবে আশা করি। রূপে যাদু রসনায় স্বাদু—কী অপরূপ মাধুরি এই বস্তুর!

একখানা নিয়ে উনি চাখতে দিলেন আমায়।

গালে দিতেই যেন গলে গেল। গলে গিয়ে আমি বললাম—উত্তম।

আরেকটা চেখে বলতে হল—'আরো উত্তম।'

উনি অন্য আরেকটা চাখতে দিয়ে বলেন—এটা কেমন?

'অতি উত্তম।'

'এটা?' পরম্পরায় উনি দিয়ে যান একটার পর একটা।

'অতিশয় উত্তম।'

'আর এটা খেয়ে দেখুন দেখি।'

'উত্তমোত্তম।' বলতে হল আমায়।

'আর এটা?'

'যার-পর-নাই উত্তম।'

তারপরও উনি দিতে থাকেন আর আমি চাখতে থাকি। কিন্তু গুণবর্ণনার ভাষা খুঁজে পাই না। তার-পর-নাই উত্তমের পরে তো আর তার-পর-নাই—সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বাদ-সহোদরই বলতে হয়।

'এটা কি রকম বলুন না?'

চেখে আমি চুপ করে থাকি। ব্রহ্মস্বাদ কি কেউ ব্যক্ত করতে পারে? পেরেছে? আমিও আর বাঙনিস্পত্তি করতে পারি না।

'উত্তমের ওপর আর বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি?'

'উত্তমের ওপর আর কী বলার আছে? আবার কী বলা যায়? তাহলে বোধ হয় সুচিত্রাই বলতে হয়।' আমি ভেবে বলি।

'যা বলেছেন। একজন নামজাদা চিত্রশিল্পীকে দিয়ে আমার সন্দেশের ডিজাইনগুলি বানানো। খাওয়া পরের কথা, এদের চেহারা দেখেই বুঝলেন কিনা……'

'চিত্রপুত্তলিকা হয়ে যেতে হয়।' আমার বোঝা নামাই।

'সন্দেশ তো টেস্ট করলেন,এবার চলুন আমাদের ব্লেডের আপিসে, সেগুলিও টেস্ট করে দেখবেন।'

'আজ্ঞে, মাপ করবেন। তা আমি পারব না।' আমি রেহাই চাই: 'দোহাই আপনার! এই সন্দেশ খাবার পর মুখ খারাপ করতে পারব না আমি।'

'কেন, ব্লেড টেস্ট করতে কী হয়েছে? তাও কিছু খারাপ নয় আমাদের।'

'কিন্তু আমার জিভ কেটে যাবে যে!'

'আহা! টেস্ট যে দুরকমের হয় তা জানেন না? সন্দেশের হোলো টি-এ-এস্-টি-ই টেস্ট আর আপনার ব্লেডের হোলো গিয়ে টি-ই-এস্-টি।'

'তাই বলুন। একজনকে গালের ভেতরে দিয়ে বুঝবার, আরেক জনকে গালের বাইরে বুলিয়ে—জানি বৈ কি! একটা গালে এলে তবেই টের পাই, আরেকটা নাগালে পেলে তবেই।'

তারপর তিনি নিয়ে গেলেন আমায় তাঁদের ক্ষুর ব্লেডের গদিতে।

'সন্দেশ তো চাখলেন। এবার নিয়ে যান আমাদের পেটেণ্ট ব্লেডের এক প্যাকেট। কাল সকালে পরখ করবেন। আর, কাল থেকেই লেগে যান আমাদের পাবলিসিটিতে।'

তাঁর সুচিত্রিত সন্দেশগুলি যে অত্যুত্তম সে বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। আমার সঙ্গে অভিন্ন-উদর যে কেউই চোখে দেখে আর চেখে দেখে, সে কথা স্বীকার করবেন। অতএব ব্লেড আর ক্ষুর পরোখ করে নিজের রোখ দেখানোর আগে তাঁর সন্দেশ নিয়েই আমার প্রচারকর্ম শুরু করলাম।

পরদিনই তাঁর আপিসে হাজির হলাম বিজ্ঞাপনের গোটা দুয়েক কপি নিয়ে।

'সেতারে সুর বাঁধা আর সন্দেশে তার বাঁধা যার তার কর্ম নয়।

তার জন্য চাই দক্ষ শিল্পী—উচ্চশ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের দরকার। আমাদের সন্দেশে আপনি মিষ্টান্নের সেই সপ্তসুরের সমাবেশ পাবেন —আস্বাদ মাত্রই যার তার আপনার অন্তরে অন্তরে ঝঙ্কার দিতে থাকবে।'

'অপিচ—আরেকটি :

'উপনিষদে তাঁকে বলেছে রসো বৈ সঃ। আবার কথামৃতে আমাদের ঠাকুর বলে গেছেন, রসে বশে থাকো। কিন্তু রসগোল্লার মতন আমাদের এই দুরন্ত জীবনসংগ্রামের সব সময় রসের মধ্যে ওতোপ্রোত হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই মাঝে মাঝে আমাদের সন্দেশ খেয়ে ব্রহ্মস্বাদের রসাবেশে আপনাকে মশগুল হতে হবে।'

দিলওয়াস্তা সাহেব কপিগুলি দেখলেন। বেশ খানিকক্ষণ। দেখে টেখে ভাবলেন খানিক। তারপরে ভেবে দেখলেন। ভেবে টেবে বললেন অবশেষে, 'দেখুন, এ আপনার সেই ধান বেচার মতই হবে মনে হয়।'

'ধান বেচা?' আমি অবাক হই, 'ধান তো বেচিনি আমি কোনকালে। তবে হ্যাঁ, শিশুকালে ধান দিয়ে পড়তে হত গাঁয়ের পাঠশালায় তা মনে আছে। কিন্তু সেটা বেচা কেনার কোনো কথাই না। গুরুমশাইকে ওমনি ওমনি দিয়ে দেওয়া।'

'আহা, ধান না হয়ে, অভিধানই হল—একই কথা। ধান বেচেও অর্থ আসে আবার অভিধানেও অর্থ পাওয়া যায়। যায় না? আমি বলছিলাম কি, বালতিওলার বিজ্ঞাপনের দৌলতে যেমন খালি অভিধান বিক্রি হয়েছে—আপনার এই বিজ্ঞাপনেও তেমনি শুধু সেতারেরই কদর হবে বাজারে—হয়ত কিছু কথামৃতও কাটতে পারে। কিন্তু সন্দেশের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ! আপনার সেই বালতির মতই দাঁড়াবে আমাদের শেষ পর্যন্ত।'

আমি নিরুত্তর থাকি। আমার এত বড় শিল্পপ্রয়োগ এহেন প্রয়োগ নৈপুণ্যের সমঝদারিতে কী আর বলবার থাকতে পারে আমার?

'না মশাই, সন্দেশে আপনার কাজ নেই। আপনি আমার

দোকানে গিয়ে যতখুশি খান সন্দেশ, দাম লাগবে না আপনার। আপনি আমার ক্ষুর নিয়েই কাজ শুরু করুন। সন্দেশ আপনি কেটে যায়—নিজের কেরামতিতেই কাটে, কিন্তু ব্লেডের বাজারে দারুণ কম্‌পিটিশন মশাই আজকাল।'

অগত্যা সেই ক্ষুরধার পথেই পা বাড়াতে হোলো আমায়।

'দেখুন, আমার ক্ষুরের যেমন ধার সেই ধরণের ধারালো বিজ্ঞাপন দিতে চাই আমি।' তিনি বলেন, 'কোন কোন কাগজে দিতে হবে বিজ্ঞাপন, দিলে বেশ কাজ হবে, তাও বলুন।'

'কোন কাগজে নয়। মগজে। আমি নতুন ধারার বিজ্ঞাপন দেব যেটা কিনা পাঠকের—পাঠক বা দর্শক যাই বলুন—তার মগজে গিয়ে সেঁটে যাবে।'

'বেশ বেশ।' উৎসাহের চোটে তু'খানা বড় সাইজের নোট তিনি আমার হাতে ধরিয়ে দেন—'এই নিন আগাম। পরে আসল দরদস্তুর হবে—আপনার কাজ দেখে—কাজের ফল দেখে তারপরে।'

সন্দেশের ওপর ওই দক্ষিণা! ওর বেশি আর বলতে হয় না।

কেন না, কথার যেমন অর্থ হয়, অর্থও তেমনি কথা কয় তো! আর সেই কথাই সবার কানে ভালো শোনায়! সোনার মতই দামী কথা।

তারপরে, আধুনিক বিজ্ঞাপনের ধারা আর ধারণা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা হল আমার।

তাঁর ক্ষুরের ধারের ওপরে সেই ধারার প্রয়োগ হলে ব্যাপারটা কদ্দুর আরো ধারালো হবে তা জানবার কোন কশুর ছিল না আমার।

তারপর বাসায় ফিরে মাথা খেলাতে বসলাম।

পরদিন আমার প্ল্যানটা তাঁর কাছে পেশ করতে যাব, তৈরি হচ্ছি এমন সময় আমার সদরে মোটরের হর্ণ শুনলাম। দেখি কি, প্রকাণ্ড গাড়ি নিয়ে তিনি নিজেই এসে হাজির।

বললেন, 'আপনার ওপর অনেকখানি আশা করে আছি মশাই! সেই কারণেই এই এত সকালে আসা আমার…' তিনি প্রকাশ করেন।

গত শত অব্দে তো বটেই, এমনকি সেদিন অব্দি নরনারীকে হাত করার পথ ছিল পণ-প্রথা। সেখানে এখন বিজ্ঞাপণ-প্রথা। এই কথাই আমি নানাকথায় বুঝিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে।

খবর কাগজের থেকে শুরু করে কোথায় নেইকো বিজ্ঞাপণ? সিনেমা-হলে, স্টেশন-স্টলে, দেওয়ালের গায়—কোন জায়গায় না? এমন কি, রাত্তিরে আলোর দেওয়ালিতেও। উজ্জ্বল নিয়ন-অক্ষরে নিজের মহিমায় জ্বলজ্বল করছে।

বেশি কী বলব, বিজ্ঞাপনেরো বিজ্ঞাপণ আমি দেখেছি। অবিজ্ঞাপিতকে বিজ্ঞাপণ দিয়ে প্ররোচিত করে' 'বিজ্ঞাপণে কী না হয়' দিব্য প্রেরণার এমন বার্তাও দেবাক্ষরে আমার চোখে পড়েছে।

'আপনার ঐ পাঁজির মধ্যেও বিজ্ঞাপণের পাঁজা'।— বিজ্ঞাপণ-পঞ্জী আরো একটু বিস্তৃত করতে হোলো আমায়—'পঞ্জিকার গর্ভেও পুঞ্জীভূত পাবেন। দিনক্ষণ দেখতে হবে—দেখতে গিয়েও রক্ষে নেই।'

'তা বটে। পাঁজিরাও আমাদের ছাড়ে না মশাই, দিতেই হয় বিজ্ঞাপণ। কবুল করতে হোলো তাঁকে।

পাঁজির পাঁঝাড়ারা তাঁকে ছাড়েনি, ক্ষুরওয়ালার ওপরেও ক্ষৌরকর্ম করে গেছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

'দেবেন বই কি। সাবেক পথে তো দেবেনই, তাছাড়াও নতুন নতুন পন্থা দেখতে হবে। নানারকম মাধ্যম অনেক রকমের 'মিডিয়া' দরকার। আর, নতুন ধারাই হচ্ছে উত্তম-মাধ্যম। সর্বদা নতুনতরো কায়দাই হচ্ছে আসল। এমনটা চাই যাতে চট করে সবার নজরে পড়ে, পড়লেই চমক লাগে, নজরে লাগলেই মনে লাগে। চোখে পড়লেই মনে ধরে যায়। তারপরে নজরানা না দিয়ে তাঁর পার নেই। এই যেমন ধরুন—' আমি বিস্তারিত করি।

আমার আনকোরা ধারণাটা ওঁর সামনে তুলে ধরলাম।

বিজ্ঞাপন-ব্যাপারে আমি যে একজন বিজ্ঞ লোক, সামনের সেই বাণিজ্যিব্যাপারীর কাছে তার খবর পেয়েই আমাকে তিনি

ডেকেছিলেন। এক লাইনের ব্যবসা না হলেও তাঁর সঙ্গে বালতিওয়ালার কেমন যেন একটা আড়াআড়ি। সেই বালতিওয়ালা আমার সম্বন্ধে তাঁকে কী বলেছিলেন জানি না। কিন্তু তাঁর আপনজনোচিত এই অযাচিত আমন্ত্রণ আমার কাছে অভাবনীয় লাগে।

এটা যেন অভাবনীয়। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা যায় কিনা কে জানে, তবে যদ্দুর তার ধারণা, আমার মনে হয়, আমার বিজ্ঞাপণের কৌশলে তাঁর বালতিতেই তাঁকে আমি ডুবিয়েছি। সে-ই তিনিই আমাকে এঁর কাছে সুপারিশ করেছেন। আশ্চর্য! নেহাৎ (বালতি) সুলভ চাপল্যের বশেই, আমার মনে হয়।

যাক গে ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই…

এ ভদ্রলোকের অবশ্যি ক্ষুরের কারবার। এস্ ডি ওয়াস্তা অ্যাণ্ড কোম্পানীর রেজারের নাম আপনি শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই। তাছাড়া এঁরা নানা কোম্পানির নামজাদা ব্লেডের এজেন্টও বটেন। তবে এঁদের নিজস্ব যা, সেই ক্ষুরের গুণ-গরিমা হাতে-গালে পরীক্ষা করে টের না পেলেও, গাল-গল্পে আপনার কানে এসেছে আলবৎ।

রেজারের জারিজুরি এঁদের। উক্ত রেজারের যে জুড়ি নেই এই কথাটা আরো ভালো করে জারি করতে হ'লে বিজ্ঞাপন-কারুর যদি কিছু কারিকুরি করার থাকে, সেইটাই আমি করব তাঁকে জানাই।

তাঁর আশা ব্যর্থ করবো, বলা বাহুল্য, এতো বড়ো আনাড়ি আমি নই। ক্ষুরের ধার যতই থাক না, ক্ষুরওয়ালা পায়ভারি কেউ আমার মতো ধারালো কারো ধারে কাছে এলে—

এসে আমার কলিং বেল টিপলে এই বেলতলায় এলে ন্যাড়া হয়ে তাকে ফিরতেই হবে।

যা হবার তাই হোলো। এ যুগের বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের কিছুই তাঁর অবিদিত রইলো না। নানা ধার থেকে তার নানান ধার সব পরিস্কার করে খুঁটিয়ে খুঁটিনাটি সমেত সমস্ত আমি জানলাম।

সবিশেষ জানিয়ে অবশেষে ওঁকে আমি রাস্তায় আনলাম ওঁরই বিরাট গাড়ি চেপে গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের রাস্তায়। তাঁর পাশে বসে আমার প্ল্যানটা পেশ করতে লাগলাম।

'রাস্তাটা ভারী বাঁকাচোরা।' তিনি বললেন: 'সিধে রাস্তা নয় মোটেই।'

'সেই তো আরো সুবিধে মশাই।' বাতলাই আমি—'এর বাঁকে বাঁকে যদি আপনার ক্ষুরের মহিমা প্রচারিত হতে থাকে, আর, যাবার ফাঁকে ফাঁকে পথচারীদের নজরে পড়ে, তাহলে···তাহলে ভেবে দেখুন মিঃ ওয়াস্তা, কতো হাজার হাজার মটর গাড়িই না রোজ রোজ মিনিটে মিনিটে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে। আর সেই সব গাড়িতে—গাড়িতে গাড়িতে ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দাড়ি। সে দাড়ি পরের কামানোই হোক, আর নিজের স্বোপার্জিতই হোক। 'নিজের' বলাটা-যদিও এখানে বাহুল্য, স্বোপার্জিত বললেই হয়, তাহলেও ক্ষুরের দরকার সবার। আর, গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের লম্বা পাড়িতে পথচলতি খালি যদি এই একটি ক্ষুরের কথাই সবার চোখে পড়ে—নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে—তাহলে ভেবে দেখুন, মিস্টার ওয়াস্তা, আমাদের আর কিসের ওয়াস্তা?"

মিস্টার এস্ ডি ওয়াস্তা ভেবে ছাখেন। আমাকেও ছাখেন একবার। তারপর আমাকে দেখে আরেকবার ভাবেন। ভাবিত হয়ে ফের আমার দিকে তাকান একনজর। সেটা তাঁর নেকনজর বলেই আমার মনে হয়।

আমার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। আমার ছক এবং নকসা-সমেত। যাবার আগে তাঁদের আরো খানদুই ক্ষুর দিয়ে গেলেন আমাকে। তাঁর উপহারস্বরূপ। বিভিন্ন আকারের ওগুলি নিজের গালে বুলিয়ে বিজ্ঞাপণের আরো কিছু চমৎকার আইডিয়া যদি আমার মাথায় খ্যালে।

খেললোও বটে। গাল ফুলে তাল হয়ে উঠলো—একবার

কামিয়েই না! একটানেই—একটাতেই। (দুখানার ধার পরীক্ষার ফুরসৎ পেলাম না আর)। ডাক্তার ডাকিয়ে টিনচার আইডিন দিনচার লাগাবার পর সারলো তারপর। কিন্তু সেকথা তো বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করবার নয়? ছাপবার কথা নয়—চাপবার কথাই।

সত্যি বলতে, ক্ষুরের চোটে এমন শাস্তি জীবনে আমি পাইনি। নিজের গালে চিড় খাওয়া—নিজের হাতে, নিজেই চাড় করে আবার! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ায় এমন দণ্ড পুলিশ ফাঁড়ির বাইরে আছে বলে আমার জানা ছিল না। এর থেকে বিজ্ঞাপনের যে প্রেরণা পেলাম, তা বেশ কিনা জানিনে, তবে এক-কথায় পেশ করা যায়। নিজের গালে এহেন ক্ষুরের চড় যে খেয়েছে, সেই চরম দণ্ডের আসামীর ভাষায় বলতে গেলে তা হচ্ছে—তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

যাক্, দাড়ি না কামালে কী হয়, টাকা কামানো নিয়ে কথা! অনেকের মাথায় ক্ষুর বোলাতে পারলেই সেটা হয়। আর বিজ্ঞাপন দিয়ে না 'বোলালে' মাথা নিয়ে বিজ্ঞজনরা আপন হতে এগুবে কেন? আসবে কেন ন্যাড়া হতে সাধ করে?

অতএব বিজ্ঞাপনের বোলবোলাও ছাড়া হলো—ফলাও করেই হোলো—আহেলি নতুন কায়দায়—শেরশাহের রাস্তার ধারে ধারে।

দিল্লী পর্যন্ত চললো এই দিললেগি। শেরশাহী রাস্তার দুধারে সেরা সাহিত্য। 'হনৌজ দিল্লী দূর্ অস্ত্।' দুর পাল্লার দুধারই ক্ষুরবার্তায় সমান ধারালো, দুরন্ত। অবশেষে, মিষ্টার এস ডি ওয়াস্তাকে নিয়ে বেরুলাম আমি একদিন। গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের রাস্তা ধরলাম—আমাদের বিজ্ঞাপন প্রচারণা দেখানোর ওয়াস্তায়। প্রচারণা বা প্ররোচনা যাই বলুন, মোটর হাঁকিয়ে চললেন তিনিই। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা, দুরত্যয়া দুর্গমং পথস্তৎ—' ভদ্রলোকের পাশে বসে আমার ক্ষৌরকার্য দেখাতে দেখাতে চলেছি—

'এইবার! এবার একটু আস্তে। আস্তে আস্তে চালান মিঃ ওয়াস্তাই

এখন থেকে—এরপর থেকেই দেখবেন—দেখতে পাবেন।' আমি তাঁকে নজর রাখতে বলি।

গাড়ির গতি একটুখানি মন্দ হলেই হয়। কখনো রাস্তার বাঁয়ে, কখনো বা ডাইনে একখানা করে নিশানা। একটুখানি সাড়া—সাইনবোর্ডের ইসারায়। সুরঞ্জিত কাষ্ঠফসকে এক ঝলক কাব্যকলা—একচোটে এক লাইনের বেশি না। আর, তার মধ্যেই পণ্যবার্তার প্রতিফলন। সেটুকু পড়তে যা পলকমাত্র সময় লাগে। পলক না পড়তেই, একটি পলের—একটির পলায়নের পরই আরেকটি। আবার আরেক সাইনবোর্ড। তাতে ফের আরেক লাইন। গাড়ি চলতে চলতেই আপনার চোখে পড়বে। এই ভাবে মাসিকের ধারাবাহিক কাহিনীর মতই ক্রমশঃ প্রকাশ্য একখানা কবিতা—একটানা কাব্যোচ্ছ্বাস!

দেখতে দেখতে উনি উৎসাহে উছলে ওঠেন। আমিও উৎফুল্ল হই। আমার কবিতা আর ওঁর দাঁত—এক সঙ্গে দেখা দেয়… ধীরে ধীরে নিজেদের পংক্তি উদ্ঘাটিত করে—যুগপৎ প্রকাশ পেতে থাকে।

কোনো রূপসী কি কভু হেথা কি হেহেস্তে…
মজা পায় সজারুর ধার কাছ ঘেঁষতে…
দাড়ি রাখতে কী বাধা ক্ষুরে দিয়ে ফারখৎ…
জানবে তো জানো দাদা, মুড়ো-ঝাঁটা মারফৎ…
চণ্ডীদাসকে কয় রজকিনী রামী হে…
বাড়ি যাও, নয়ত বা এসো দাড়ি কামিয়ে…

দেখে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন—থাকতে পারেন না আর—'বাহোবা কি বাহোবা! এ রকমের বঢ়িয়া বিজ্ঞাপন আমি জিন্দগীতে দেখিনি। ভাবতেও পারিনি কখনো। হবেই। আলবৎ এতে ফয়দা উঠবে।'

'উঠতে বাধ্য।' আমি সায় দিলাম—'বিজ্ঞাপনে কী না হয়? কিন্তু আপনি বসে বসে গাড়ি চালালে ভাল হোতো না কি…'

'এর পরে আরো কী আছে দেখা যাক—' ঔৎসুক্যের আতিশয্যে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালান।

তারপরেও ছিলো। আমার অধ্যবসায়ের সেখানেই শেষ হয়নি।···

কণ্টকে শোভা পায়
যথার্থ। গোলাপই···
পুরুষ গোলাপ নয়
ছিলো নাকো কদাপি···

'দাঁড়ান দাঁড়ান!' আমি চেঁচিয়ে উঠি হঠাৎ, এবং তারপর আর দাঁড়াই না। নিজের প্রাণ হাতিয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়ি গাড়ির থেকে। ওঁর দাঁড়াবার তোয়াক্কা না রেখেই।

তারপর?

তারপর আর ছিল না। পুনঃ পুনরুক্তি ছাড়া কবিতার ছিল না কিছু আর। দিল্লী পর্যন্ত চলেছিল এই দিল্লেগি!

কিন্তু তারপরেও আরো চার ছত্তর লিখতে হোলো আমায়। নিতান্ত নাচার হয়েই আমি লিখলাম।···বিজ্ঞাপন-ভারতীর পদাবলীর শেষে কাব্যলক্ষ্মীর সেই শেষে পাদচারনা···

মর্মান্তিক সেই চার লাইন অকুস্থলের মর্মরফলকে নিরবধি কালের নিমিত্ত মর্মরিত হতে থাকলো···

হেথা চিরনিদ্রিত
শেখ্ দিলওয়াস্তা।
দেখেছে বিজ্ঞাপন
ছ্যাখেনি কো রাস্তা॥

॥ তিন ॥

কেন এ পথে এলাম !

সব পথিকের মনেই···চিরদিনের এই প্রশ্ন। কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে!' নিয়তি কি কেন-র বাধ্য ?

স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সাহিত্যিক হওয়ার মানে, সহজপথ পরিত্যাগ করা। সেটাকে অসাধারণ কিছু হওয়া বলে মানতে আমি প্রস্তুত নই। ক্ষয়রোগ পাওয়া কি অসাধারণ কোন লাভ ? তেমনি লেখকপনার অক্ষয়রোগীরা সাধারণ লোকের অতিক্রম নয়, ব্যাতিক্রম মাত্র।

প্রথম পদস্খলনের মত কারো প্রথম গল্প লেখাকে একটা দৈব দুর্ঘটনাই বলতে হয়। এবং পথভ্রষ্টকে ক্রমশ অধঃপতনের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে সেই প্রাথমিক হঠকারিতাই যথেষ্ট। কেন যে আমি এই বিপথে এলাম এবং কি করে এলাম—এই লেখাটি তারই কাহিনী। আমার সেই প্রথম গল্পরচনার জন্মবৃত্তান্ত।

আর সকলের মত, আমার গল্পও অতি কাঁচা বয়সের কাণ্ড। একেবারে ছোটবেলার। আর তার শ্রোতা এবং সমঝদারও মাত্র একজন। স্বভাবতই তিনি—মা।

—'তুমি জিনিস কিনতে যে দুয়ানিটা দিলে মা, সেটা কোথায় যে পড়ে গেল!'

এই কথা মাকে যেদিন প্রথম বলেছি, সপ্রতিভ ভাবেই বলতে পেরেছি, বলতে গেলে আমার প্রথম গল্প ঠিক তখনকারই রচনা।

অবশ্যি, ধরতে গেলে, আমার প্রথম গল্প শোনাও যার মুখ থেকে। রূপকথার গল্প। অতএব মাকেই নিজেরই গল্প শোনানো—আমার এই অপরূপ কথা—কিছুটা প্রতিশোধস্পৃহার থেকে প্রণোদিত—তাও হয়তো বলা যায়।

তবে বাল্যকালের লেখা এবং পরকালের লেখায় পার্থক্য আছে। দুইই পড়বার জিনিস—প্রথমটা চাপা আর পরেরটা ছাপা। এই চাপা পড়া লেখাদের সমাধিস্তূপ থেকে ছাপা পড়া লেখাটির আবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধান থাকে···সময়ের ব্যবধান। প্রথম রচনা আর প্রথম প্রকাশনা এই উভয়ের মধ্যে অনেক ফারাক। এবং ফাঁড়া অনেক।

আমার প্রথম প্রকাশিত লেখা কিন্তু গল্প নয়। তা হচ্ছে কবিতা, বলাই বাহুল্য এমন একটা বয়েস আছে যখন কবিতারা ঠিক দাড়ির মতই আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। কবিতা আর দাড়ি, বলতে কি, প্রায় এক সঙ্গেই শুরু হয়। অযাচিত এসে যায়—সেই প্রথম বয়েসটায়! কিন্তু গল্প (মানে রীতিমত, গল্প) তখন কিছুতেই আসে না।

গল্পকে আনা ভারী দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কোন বয়সেই অনেক টেনে হিঁচড়ে তাকে আনতে হয়! গল্পরা তো কবিতার মত, কিংবা দাড়ির মতন, নিজের ভেতর থেকে আপন প্রেরণায় গজিয়ে ওঠে না, তারা ছড়িয়ে থাকে মানুষের জীবনের পাতায় পাতায়। আপনার আমার—এর ওর তার—জীবনের পৃষ্ঠায় তার সমাবেশ। সেখান থেকে তাদের দেখে শুনে বেছে চুনে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হয়। তারপর নিজের পছন্দসই পোষাকে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রকাশযোগ্য করে বার করতে হয় সবার সামনে।

প্রথম বয়সে গল্প সাজানো এক দারুণ সাজা। কেবল গল্পের পক্ষে নয় লেখকের পক্ষেও; এবং সে গল্প যদি পাঠককে পড়তে হয় তাহলে তার পক্ষেও কিছুমাত্র কম না। আমার প্রথম গল্প কতদিন আগেকার লেখা আমার মনে নাই, কিন্তু সে যে কত কষ্ট করে লেখা তা এখনো আমি ভুলতে পারিনি। আমার সেই প্রথম গল্প লেখার গল্পই আপনাদের এখন বলতে যাচ্ছি।

আপনারা আমার গল্প পড়েছেন কি না জানিনে। যদি ভুল ক্রমে

এক আধখানা উলটে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনাদের মনে হয়েছে স্রেফ গাঁজা। কারো কারো এরূপ মনে হয়, এবং কেবল মনে হওয়াই নয়, মুখ ফুটে সে-কথা অকপটে ব্যক্তও করেন কেউ কেউ। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রায় সব গল্পই সত্য ঘটনা; এই জীবনে, হয়তো এই অধমকে নিয়েই দুর্ঘটিত; এবং তার কোনটাই গাঁজা নয়; হয়তো বা কোথাও একটু অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাহলেও তা আমার এই মুষ্টিমেয় জীবন থেকেই গাঁজানো।

আমার প্রথম গল্পটাও ঠিক এইভাবে অকস্মাৎ আমার জীবন থেকে গেঁজে উঠেছিল। জীবন থেকে গল্প গেঁজে ওঠা যে কী ব্যাপার তা এই কাহিনী পড়লেই আপনারা টের পাবেন। আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজে গুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়তো হাস্যকর বলে মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু যখন তারা আমার সামনে বা আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গঞ্জনাদায়ক। মোটেই হাস্যকর নয়, অন্তত আমার পক্ষে তো নয়। জীবনকে, এই জন্যেই বুঝি অনেকে ট্রাজেডি বলে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন না। আমার জীবনের ট্রাজেডিগুলো গল্পাকারে লিখতে গিয়ে, লেখার দোষে কিংবা লেখকের অক্ষমতায় হয়তো হাস্যকর হয়ে দেখা দেয়—কিন্তু তা পড়ে আপনাদের হাসি পেলেও, আমার গল্প পড়ে আমার নিজের কখনো কদাচই হাসি পায় না। অন্তত সেই গাঁজানো বা গজানোর সময় তো নয়ই।

আমার এই প্রথম গল্পটাও ঠিক এমনি করেই গজিয়েছিল। শুনুন তাহলে। সেদিন ছিল পয়লা বোশেখ! কলম নিয়ে বসে কী লিখি কী লিখি করছিলাম। কিছুই আসছিল না কলমে। নিজেকে নিজ মনে বলছিলাম, গল্প হচ্ছে জীবন-দর্শন, জীবনকে কোথায় কীভাবে দেখেছ মনে করো, ভেবে ছাখো, তারপরে তার মধ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্যাজাল মিশিয়ে লিখে ফ্যালো। লোকচক্ষে এনে বার করা তার পরের কথা। বলি, বাপু, জীবনের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?

যতবারই প্রশ্ন তুলি ততবারই জীবনবাবু বলে এক ব্যক্তির ছবি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। শখ কিংবা পেশা কে জানে, বাড়ি বাড়ি ঘড়ির দম দিয়ে বেড়ানোই ছিল জীবনবাবুর কাজ। তাঁকেই আবার ফিরে মনশ্চক্ষে দেখি, আসল জীবনের আর দেখা পাই না।

অবশেষে বিরক্ত হয়ে কলম ফেলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম। সামনেই পড়েছিল রিসিভারটা, আমার টেবিলের এক কোণে। এবং সেই মুহূর্তেই জীবনের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। আমার প্রথম জীবনসাক্ষাৎ! আর সেই ঘটনা (কিংবা দুর্ঘটনা) থেকেই আমার প্রথম গল্প গেঁজে উঠল। সাক্ষাৎ জীবনী থেকে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে এল গল্পটা।

কিন্তু এখন কাকে ফোন করি? টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম। আজ সম্বচ্ছরের প্রথম দিন—কাউকে ডেকে নতুন বছরের সাদর সম্ভাষণ জানালে কেমন হয়?

কিন্তু কাকে জানাই? কাকে আবার? যাকে তাকে, যাকে খুশি তাকেই। আজকের দিনে কে আপনার, কে-ই বা পর? একধার থেকে ডেকে ডেকে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিই। ধরে পাকড়ে তাই করাটাই কি ঠিক হবে না?

টেলিফোন ডিরেক্টরী নিয়ে নাড়াচাড়া করি। অসংখ্য নাম। নম্বরও বহুৎ। কোন্ ধার থেকে শুরু করা যায়?

চক্রবর্তীদের নিয়েই আরম্ভ করা যাক না! চ্যারিটি বিগন্স অ্যাট হোম। তাছাড়া বঙ্কিমবাবুও বলে গেছেন—। কী বলে গেছেন? না, চক্রবর্তীদের নিয়ে বিশেষ করে কিছু বলেন নি, তবে চক্রবর্তীদের নিয়েও সেকথা বলা যায়। একটু ঘুরিয়েই বলতে হয় বলতে গেলে। হ্যাঁ—চক্রবর্তীকে চক্রবর্তী না ডাকিলে কে ডাকিবে?

অতএব একে একে চক্রবর্তীদের ধরে ধরে ডেকে যাই। এবং মিষ্টি করে নববর্ষের সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। আমার দ্বারা,

তাদের চক্রবর্তীসুলভ যৎকিঞ্চিৎ জীবনে কিছু কিছু আরামের আমদানি হোক। ক্ষতি কি?

কিন্তু চক্রবর্তীও খুব কম নেই। তারাই দেড় গজ জুড়ে আছে ডিরেক্টরীর। কলকাতার ফুটপাত হতে পারে, কিন্তু টেলিফোনের পাতারাও যে এমন চক্রবর্তীসঙ্কুল এ ধারণা আমার ছিল না। যাই হোক, প্রথম একটা চক্রবর্তীকে পছন্দ করলাম, এবং টেলিফোনটা কাছে এনে রিসিভারটা তুলে ধরলাম—যথারীতি নম্বর বলা হল। অনেকক্ষণ ধরে কোন সাড়া-শব্দ নেই। হালখাতায় বেরিয়ে গেছেন নাকি ভদ্রলোক? য়্যাতো বেলা পড়ে থাকতেই? বিচিত্র নয়, চক্রবর্তীরা যেরূপ মিষ্টান্নলোলুপ আর উদর-হৃদয়, অবাক হবার কিছু নেই।

বহুক্ষণ বাদে একটা আওয়াজ এল। মাছের মুড়ো মুখে করে কে একজন কথা বলছে বোধ হল আমার। 'রং নম্বার। রং নম্বার। রং নম্—' বলতে বলতেই নিরুদ্দেশে মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ।

ভারী বিরক্তি লাগে। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাতে বসে মন্দ না। ভাব জমাবার গোড়াতেই আড়ি। দূর দূর!

রিং করতে শুরু করি ফের।

আওয়াজটা আবার ঘুরে আসে—এসে জানায়ঃ 'নাম্বার এনগেজড।'

এবং এই বলেই আবার সেটা উধাও হবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। 'শুনুন মশাই, শুনুন।' উপরচড়াও হয়ে আওয়াজটাকে পাকড়ে ফেলি।

'বলুন। বলুন তাহলে।' আওয়াজটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে মনে হয়।

'আপনিই শ্রীযুত চক্রবর্তী?' আমি বলি।

'না—।' মেগাফোন-বিনিন্দিত কণ্ঠে উনি জবাব দিলেন।

'আপনি—আপনি কে তবে?'

'এই। এই ঠাকুর। ইলিশমাছের রোস্ট কই আমার?

রোস্‌ট? ইলিশের গোস্‌ত্‌ কাবাব? যাও, নিয়ে এস জলদি। য়ঁ্যা, কী বলছেন? আমি? আমি কে? বলেছি তো আমি রং নম্বার। তার ওপরে এখন আবার রীতি মতন এনগেজ্‌ড্‌।'

তারপর আর কোন উচ্চবাচ্যই নেই। কিন্তু আমিও সহজে পরাস্ত হবার পাত্র না। আমার আরেক ডাকাতি শুরু হয়। ও-বেচারী এখন নাচার—রোসটলেস বলেই হয়তো রেস্টলেস এবং চক্রবর্তীও হয়তো নয়। দেখে শুনে দ্বিতীয় এক চক্রবর্তীকে ডাক দিই।

আপনিই কি মিস্টার চক্রবর্তী?'

'হ্যাঁ, আপনি কে?'

নিজের নাম বললাম।

টেলিফোনের অপর-প্রান্তবর্তী সশব্দে ফেটে পড়লেন—

'বাধিত হলাম। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না মশাই! নামও শুনি নি কক্ষনো। আমার কাছে কী দরকার আপনার?'

'আজ্ঞে, দরকার এমন কিছু নয়। এই, কেবল আপনাকে আমার নমস্কার—অর্থাৎ—এই নববর্ষের—'

'কে হে বদ্‌ ছোকরা? ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পাও নি? আধঘণ্টা ধরে রিং করে অনর্থক বাথরুম থেকে টেনে আনলে আমায়? এখন ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি হবে, সর্দি বসে গিয়ে ব্রংকাইটিস হবে। তারপরে নিউমোনিয়া দাঁড়িয়ে নিমতলা হয় কিনা কে জানে। হায় হায়, তোমার মতন গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে অবশেষে আমি বেঘোরে মারা পড়লাম।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনেকশন কেটে দিলেন। নববর্ষ অবধি হয়ে থাকল, সাদর সম্ভাষণটা ভালো করে জানাবার ফুরসৎটুকুও পাওয়া গেল না সে অবকাশ তিনি দিলেন না আমায়।

আবার ডাক দিতে হল ভদ্রলোককে। দুঃখের সহিত, সেই বাথরুম থেকেই টেনে আনতে হল আবার। কী করব? কোন কাজ অসমাপ্ত কি অর্ধসমাপ্ত রাখা ঠিক নয়। সেটা চকর্‌বর্তীদের কাজ না।

বিশেষ করে আজকের দিনে কারো সঙ্গে—নতুন বছরের প্রথম খাতির জমাতে গিয়ে অখ্যাতি-লাভটা যেন কেমন—!

'আপনি মিস্টার চক্রবর্তী ?'

'আলবাৎ। আমিই সেই। তুমি কোন বেয়াক্কেলে ?'

'আজ্ঞে, আমি—আমি—' আমৃতা আমৃতায় দ্বিধাভরে বলতে যাই।

'একটু আগেই তো আমার জবাব দিয়েছি, আবার কেন ? আচ্ছা ত্যাঁদোড় তো!—'

এই বলে সশব্দে তাঁর রিসিভার ত্যাগ করলেন, স্বকর্ণেই শুনতে পেলাম। আমাকে পরিত্যাগ করে আবার তাঁর বাথরুমেই প্রস্থান করলেন বোধহয়। নাঃ, উনি ওঁর জীবনকে সমুজ্জ্বল করতে উৎসুক নন। অন্ততঃ আপাতত এই মুহূর্তে যে নন, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

তালিকার তৃতীয় ব্যক্তিকে ধরে টানি এবার।

'শ্রীযুত চক্রবর্তী আপনি ?'

'ঠিক ধরেছেন ? আপনি কে ?'

'আজ্ঞে, আমিও আরেক শ্রীযুত—আজ্ঞে হ্যাঁ, চক্রবর্তীই।' যুতসই হয়ে জানিয়ে দিই।

'ও, তাই নাকি ?' চোখা গলায় বলতে শুরু করেন তৃতীয় ব্যক্তি :

'দু হপ্তা ধরে আমি গরু-খোঁজা খুঁজছি আপনাকে। সেই যে আপনি কেটে পড়লেন দালালির টাকাটা মেরে দিয়ে তারপরে আপনার আর কোন পাত্তাই নেই। আচ্ছা লোক আপনি যাহোক। আপনার আক্কেলকে বলিহারি।'

আমি একটু বিব্রত বোধ করি। সাদর সম্ভাষণের পূর্বেই একজন অপরিচিতের কাছ থেকে এতটা মোলায়েম অভ্যর্থনা—এমন সাগ্রহ হাপিত্যেশ আমি প্রত্যাশা করি নি। বিশেষ করে একটু আগেই, দু'-দুটো সংঘর্ষ সামলাবার ঠিক পরেই। আমি তো কেবল সম্ভাষণ করেই সারতে চাই, এবং সরতে চাই। তারপরে আর কিছুই চাই না। কিন্তু ইনি তো দেখছি তারও বেশি অগ্রসর হতে উদ্‌গ্রীব।

যেভাবে—যেরূপ ঘোরতরভাবে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন বললেন, তাতে হয়তো এর পরেও রীতিমত ঘনিষ্ঠতা জমাবার পক্ষপাতী বলেই তাঁকে মনে হয়। এখন, ধরে বেঁধে কোরবানি না করলেই বাঁচি।

আমার তরফে বাক্যস্ফূর্তি হতে বিলম্ব হয়, স্বভাবতঃই একটু সময় লাগে। 'এ কি! চেপে গেলেন যে একেবারে?'—অন্য তরফে সম্ভাষণের দ্বিতীয় পালা শুরু হয়েছে ততক্ষণে: বেশ ভদ্রলোক আপনি! দালালির টাকাটা তো অক্লেশে মেরে দিয়ে যেতে পারলেন, কিন্তু এই পচা বাড়িতে কোনো মানুষ বাস করে? এঁদো, ড্যাম্পো, মশার আড্ডায়, কাঁকড়া বিছের সঙ্গে থাকতে পারে কেউ? এরকম বাড়ি আমাদের ভাড়া গছিয়ে এভাবে ঠকিয়ে কী লাভ হল আপনার শুনি?' তিনি জবাবদিহি চান।

কী জবাব দেব? এবার আমাকেই কনেকশন কাট আপ করতে হল, সম্বন্ধ বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। দফায় দফায় কারো রাহাজানি চললে তার সঙ্গে রফা করে নিজের দফা রফা করা আমার মত সুরাহাবাদীর রপ্ত নয়। কাজেই, বিদায় সম্ভাষণ না করেই সাদর সম্ভাষণ স্থগিত রাখতে হল—বাধ্য হয়েই—কী করব?

এবার চতুর্থ ব্যক্তির উদ্দেশে ডাক ছাড়লাম। এবং তাকে কাছাকাছি পাবা মাত্রই আর অন্য কথা পাড়তে দিই না, সর্বপ্রথমেই আমার কাজ সেরে নিই:

'শ্রীযুত চক্রবর্তী! আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাই। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ!...'

কাঁদো-কাঁদো গলায় জবাব আসে: 'তা জানাবে বৈকি! তা না হলে বন্ধু? তা না জানাবে কেন? আজ তো তোমাদেরই সুখের দিন হে, তোমাদেরই স্ফূর্তি। এতদিনে আমার সর্বনাশ হয়েছে, পরশু মামলায় হেরেছি, কাল শ্বশুরমশাই আত্মহত্যা করেছেন, আর আজ সকাল থেকে যত কাবলেওলায় ছেঁকে ধরেছে, আগামীকাল আমায় দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হবে, আজই তো তোমাদের মত হিতৈষীদের

সহরমের সময় গো। আনন্দ উথলে ওঠবার দিন তো। আমার সর্বনাশ না হলে আর তোমাদের পৌষমাস ফলাও হবে কি করে?'

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হতে থাকে।

এই ব্যক্তিকেও, এই চক্রবর্তীটিকেও, বরখাস্ত করে দিই তৎক্ষণাৎ। যে রকম বুঝছি, সব দিক থেকেই আমার সাদর সম্ভাষণের একদম অযোগ্য বলেই এঁকে বোধ হচ্ছে। নববর্ষের জন্য একেবারেই ইনি প্রস্তুত নন। অতএব, পঞ্চম চক্রবর্তীকে বেশ একটু ভয়ে ভয়েই ডাকতে হয়।

সাড়া দিতে না দিতেই সদ্যলব্ধ চক্রবর্তীমশাই আরম্ভ করেন—'বুঝেছি, আর বলতে হবে না গলা পেতেই চিনেছি। তা, সুদটা দিচ্ছেন কবে শুনি? আসল দেবার তো নামই নেই। কত জমে গেল খেয়াল আছে? অ্যাঁ? একেবারে উচ্চবাচ্যই নেই যে! ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার মতন এক নম্বরের এমন জোচ্চোর আর একটাও চোখে পড়ল না। একবার যদি সামনে পেতাম—মেরে পস্‌তা ওড়াতাম তোমার।' পস্‌তালেন তিনি।

আর বেশী শোনবার আমার সাহস হল না। পস্তায়মান এই ধারদাতার ধারালো ধাক্কায় আমি আঁধার দেখলাম। তা ছাড়া—সামান্য সাধারণ একজন, এক নামমাত্র চক্রবর্তীকেই আমি ডাকতে চেয়েছিলাম, এহেন কোন রাজচক্রবর্তীকে না।

রিসিভার নামিয়ে অনেকক্ষণ কাহিল হয়ে থাকি।

তারপর বিস্তর ইতস্ততঃ করে ষষ্ঠ ব্যক্তির জন্য রিসিভার তুলি—। কথায় বলে, বার বার তিনবার। আবার তিনে শত্রুতাও হয়, বলে থাকে। অতএব, কার্যতঃ, তিনবারের ডবল করে, নয় ছয় করে তবেই ছাড়া উচিত—

'হ্যালো, আপনি কি শ্রীযুত চক্রবর্তী? ও, আপনি? নমস্কার! আমি? আমিও একজন চক্রবর্তী—আপনারই সগোত্র নগণ্য এক

নরাধম। হ্যাঁ, নমস্কার! আজ নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সাদর সম্ভাষণ—আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অন্য তরফ থেকে অন্যতর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—বেশ গদগদ স্বরে। মোলায়েম আর মিহি হয়ে। এ চক্রবর্তীটিকে অন্যান্য চক্রবর্তীর থেকে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়! বঙ্কিমবাবুর কথাটা রকমফের হয়ে এঁরও যেন জানা আছে মনে হচ্ছে!

তিনি বলতে থাকেন—'ধন্যবাদ! হ্যাঁ, কী বললেন? নামটা তো বললেন, কিন্তু আপনার ঠিকানাটা, একশো চৌত্রিশ নম্বর, বেশ বেশ! রাস্তার নাম?…বাঃ! নাম ঠিকানায় কবিতা মিলিয়ে হরিহরাত্মা হয়ে আছেন দেখছি, বাঃ বাঃ! এই তো চাই। ছেলেপিলে ক'টি? একটি। আপনিই একমাত্র? তার মানে? ও, এখনো বিয়েই হয় নি? হবার আর আশঙ্কাও নেই? তা না থাক! মানুষ আশাতেই, এমন কি, আশঙ্কা নিয়েও বেঁচে থাকে। বয়েসটা কত বললেন? আন্দাজ করা একটু কঠিন? আটাশ থেকে আটাশীর মধ্যে? তাহলেই চলবে। এত কথা জিজ্ঞেস করছি কেন? এক্ষুনি জানতে পারবেন, আমি যাচ্ছি আপনার কাছে। না না, কোন ঘটকালি নয়। তবে আপনি যেমন আমাকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করলেন, তেমনি আজ নববর্ষের প্রথম দিনে একটা ভাল কাজ আপনার জন্যও আমি করতে চাই। আপনার জীবনবীমাটা আজই করে ফেলুন। শুভস্য শীঘ্রম্। জীবন-বীমার দ্বারাই জীবনের সীমা বাড়ানো যায়। অতএব শুভকাজ দিয়েই বছরের প্রথম শুভদিনটা আরম্ভ হোক। কেমন?… দাঁড়ান, এই দণ্ডেই আমি যাচ্ছি।'

এই প্রত্যুত্তর লাভের পর আমি ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম, কী বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম আমার মনে নেই। তবে এই কাণ্ড থেকেই খাতার পাতা ভেদ করে আমার প্রথম গল্পের পল্লব গজিয়েছিল। এবং সেই গল্প এতদিন ধরে অনাদরে পড়েছিল আমার কাছে। পড়েছিল বলেই আজ আপনাদের আমার প্রথম লেখা এবং কি করে

সেটা লেখা—জানাবার এই সুযোগ আমার হল। এর জন্য যা কিছু ধন্যবাদ তা কোন এক, বা অনেক, সম্পাদকের প্রাপ্য। লেখাটা তাঁদের দরবার থেকে বারবার অমনোনীত হয়ে উপর্যুপরি ফেরত না এলে আজ এইরূপ, এহেন অভাবিত ভাবে, আকাশের মাধ্যমে ঈথারের সাহায্যে বিস্তার লাভ করার এমন সৌভাগ্য আমার হত কি না সন্দেহ।

॥ চার ॥

শিক্ষাদানের পর শিক্ষালাভের এক পর্ব এসেছিল আমার জীবনে ঠিক তার পরই। তবে, আমার মনে হয়, এটাকে ঠিক পর্ব না বলে একটা পার্বণ বলাই উচিত বুঝি। এবং হিমালয় পর্বত থেকে গন্ধমাদন ঘাড়ে করে শ্রীহনুমান যে পাহাড়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার চেয়েও জবর হয়েছিল আমার এই শিক্ষালাভটা।—যেহেতু এটা হয়েছিল আমার হাড়ের ওপর দিয়েই একেবারে হাড়ে হাড়ে শিক্ষাই।

শিক্ষার কোনো রাজপথ নেই। সারাজীবনই হচ্ছে নাকি শিক্ষা পাবার। শিক্ষালাভই আমাদের গোলকধাম, যথার্থ। কিন্তু তার পথটা হচ্ছে গোলকধাঁধার। সে পথের অলি-গলি, ঘোর-প্যাঁচ সবই আমার কাছে রহস্যময়।

শিক্ষার সমস্যা নানাবিধ। শিক্ষা দেয়ার সমস্যা, শিক্ষা পাওয়ার সমস্যা এবং শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষালাভ করার আরেক সমস্যা।

হাতে-খড়ির থেকে শুরু হয়ে প্রতিপদে দেখা দিয়ে শিক্ষার পূর্ণিমা (কিংবা অমাবস্যা) পর্যন্ত তার জের চলে—এই দোরোখা টানাপোড়েনের মধ্যে শিষ্যের চেয়ে গুরু হওয়ার সমস্যাটাই গুরুতর। আর তাই শেষ পর্যন্ত জের বার করে—অবশেষে টের পাওয়া যায়। এবং তার ষোলো কলার একটা কলা আমার ভাগ্যে একদা দেখা দিয়েছিল। সেই এক কলাতেই গুরু-পূর্ণিমা হয়ে গেল, বারোটা

বেজে গেল অধম এই গুরুদেবের। পনেরো দিন না পেরুতেই ঘোরতর কৃষ্ণপক্ষ দেখা দিল আমার জীবনে—আমার শিক্ষাদান ব্রতের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়। উক্ত কদলী-দর্শন মর্মান্তিক।

জনশিক্ষার খুব হুজুগ চলছিল তখন। আমাদেরও কয়েকটি পাড়া মিলিয়ে একটি জনশিক্ষা সমিতি খাড়া করা হয়েছিল। তার সভাপতি (আসলে তিনি জনশিক্ষাদানের ঘোর বিরোধী) একদিন ডেকে পাঠালেন আমায়।

গেলাম। যেতেই তাঁর ধিক্কারধ্বনি শুনতে হোলো—"আরে ছ্যা ছ্যা! পাড়ার কোনো ধারে তো পা ফেলার জো নেই। কোথাও চুবড়ি বুনছে, কোনোখানে সুচিশিল্প, কোথাও বা হিন্দী-শিক্ষা, কোনো জায়গায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কোথাও আবার রাজনীতির ব্যাখ্যানা। কিন্তু তোমার পাশেই যে একটা আকাটমুখ্যু রয়েছে খবর রাখো তার? নিজের নামটা পর্যন্ত বানান করতে জানে না। আগে নিজের ঘর সামলাও, তারপর তো পরকে—বিশ্বের লোককে শিক্ষা দেবে!"

পাশের বাড়িকে নিজের ঘরের মত জ্ঞান করতে স্বভাবতই আমার দ্বিধা থাকলেও নিজের দোষ ঘাড় পেতে নিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, "ও মুখের দুঃখ প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই। লেখাপড়া শেখাও লোকটাকে। পারো তো আজ থেকেই লেগে যাও। বেচারার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—যুগ যুগ ধরে আমাদের যে জ্ঞানভাণ্ডার, যে রসের খনি সঞ্চিত হয়ে পুঞ্জীভূত রয়েছে, তার কোনো পাত্তাই সে পাচ্ছে না—সব স্বাদ সমস্ত আস্বাদে বঞ্চিত। আহা! ভাবতেও প্রাণে ব্যথা লাগে। যাও, আর দেরি কোরো না। লেগে পড়ো গে!" বলেই কথাটা তিনি শুধরে নিলেন—"মানে, লেগে পড়াও গে। আরে, ভেবে দেখলে তো আসলে তোমারই লাভ—শেষ পর্যন্ত। তুমি যখন লেখক, তখন তোমারই তো একজন পাঠক বাড়বে। কালে ও তোমার বইও এক আধখানা কিনতে পারে। কিনলেও কিনতে পারে। কিনে পড়াটাও অসম্ভব নয়।"

তা বটে…! তক্ষুণি ফিরে আমি সেই বাঞ্ছনীয়ের খবর নিলাম। নাম তার পার্থ, বেশ তাক-লাগানো নাম এবং দেখা গেল সত্যিই! নিজের নামের বানানটাও তার জানা নেই—মানে তো দূরে থাক! শিক্ষালাভের যে তার নিতান্ত প্রয়োজন তার সন্দেহ কি!

কিন্তু শিক্ষালাভ করা তার পক্ষে সুকঠিন। পাশের বস্তিতে থাকলেও কেন যে সর্বদা আড়ালে থাকে, এবং কেন যে আমার নজর এড়িয়েছে তার কারণও জানা গেল। মাঝে মাঝে সে ডুব মারে দিনকতকের জন্য। কোথায় যে যায় বলা যায় না। তারপর ফিরে এলে দেখা যায় পুলিস তাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জেল-হাজত থেকে ফিরে এসে দুদিন বাদে আবার সে উধাও! এবং ফের আবার ফিরতে না ফিরতেই পুলিস! এরকম হরদম যাতায়াতকারী ছাত্রের কাছে রেগুলার অ্যাটেন্‌ডেন্‌সের যে কোন আশা নেই, বস্তির অনেকেই সে-কথা আমাকে সমঝিয়ে রাখল।

তবু পার্থকে ডাক দিলাম। ভেবেছিলাম, আসতেই ক্লৈব্যং মাস্মঃ গমঃ পার্থ! বলে গীতার শ্লোকটা সরল বাংলায় প্রাঞ্জল করে ওকে বোঝাব, কিন্তু প্রয়োজন হোলো না, যুদ্ধের জন্য মারমুখী হয়েই সে এসেছিল।

শুরু হবার আগেই গুরুকে মারা বোধহয় গুরুমারা বিদ্যে নয়। কিন্তু তা না হলেও, এমন ছাত্রের পক্ষে তাও অসম্ভব না, প্রথম দর্শনেই আমি টের পেলাম। তবুও গুরুগিরি করতে গিয়ে শুরুতেই পেছোলে চলে না—যতই পেছল পথ হোক। পার্থের প্রতি প্রযোজ্য শ্লোকটা মনে মনে নিজেকে বলে বুকে বল বেঁধে এগুলাম।

"শুনছি তুমি নাকি লিখতেও জানো না, পড়তেও পারো না?"

"না মশাই।" ঘাড় উঁচু করে সে বলল। বেশ জোরেই—যেন এটা খুব বাহাদুরির।

"একথা ভালো নয়। খুব নিন্দার কথা। এতখানি বয়েসে মুখ্যু

হয়ে থাকার মতন দুঃখ্যু আর নেই। জানো তুমি কী হারিয়েছো, আর কী কী হারাচ্ছ ?"

বলে থামলাম একটু—তাকে চিন্তা করে বিবেচনা করে দেখবার অবকাশ দিলাম। কিন্তু সে যে বিশেষ ওয়াকিবহাল তা বোধ হোলো না। অগত্যা আমাকেই বিশদ করতে হোলো : "লেখাপড়া শিখলে রাস্তার নাম বাড়ির নম্বর তুমি পড়তে পারতে—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তোমার অপাঠ্য ছিল না। সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ তোমার সামনে উন্মুক্ত উদ্‌ভাসিত হোতো—তা জানো ? তোমার কি বিদ্যালাভের চেষ্টা করতে ইচ্ছা হয় না ?"

"একবার আমি সবকিছুই বাজিয়ে দেখতে রাজী আছি।"

"বাঃ, এই তো বেশ কথা ! ভালো কথা !" আমি বললাম : "কিন্তু একবার চেষ্টা করার কাজ এ নয়, তোমাকে বারম্বার চেষ্টা করতে হবে, বিদ্যালাভ অত সহজ বস্তু না। প্রথমেই এটা জেনে রাখো।

পার্থ হাসতে লাগল। অদ্ভুত এক হাসি। যাক, যখন হেসেছে তখন ওর মন পাওয়া গেছে। এবার সেই মন পড়ার বইয়ে এসে বসলেই বাঁচি। দেশব্যাপী অজ্ঞতার ঘোরালো অন্ধকার, অন্তত কিছু পরিমাণে, ঘোচানো ঠিক না গেলেও, একটুখানি যে ফিকে করা যাবে তাই ভেবেই আমি স্বস্তি পেলাম। "আচ্ছা কাল থেকে রোজ এক সময় তুমি আমার বাসায় আসবে। তোমার বই খাতা পেনসিল সব আমি যোগাড় করে রাখব।"

এক সময়ে তো আসতে বললাম, কিন্তু কোন সময়ে এলে ভাল হয় আমি ভাবি। সময় আমার কই ? সময়ের প্রতি আমার তেমন টান না থাকলেও সময়ের আমার খুব টান। আচ্ছা, ভেবে দেখা যাক। সকালটা আমার তুলো পেঁজানোর ক্লাস, বিকেলটা চরখা কাটবার। তখন হয় না। রাত্রে আমাকে গীতার ভাষ্য করতে হয়—অবশ্যি বাংলা অন্বয় অনুবাদ অনুসরণ করেই। আচ্ছা, দুপুরের হিন্দী-শিক্ষা আর সাইকেল-সাধনার মাঝখানে ঘণ্টাখানেক

পাওয়া যায় না? সেই সময়েই ওকে পড়ানো যাবে।—সেই ভালো। ওর উৎসাহ তো দেখা গেছে, এখন দেখি কদ্দূর উন্নতি করে।

কিন্তু উন্নতি ঘোড়ার ডিম। পার্থ সে পাত্রই নয়। সে পদার্থই না। শিক্ষা আদান-প্রদানের সারাক্ষণ সে এমন বিরূপ ভাব নিয়ে বসে থাকে যে, মনে হয় যেন ওর সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা করা হচ্ছে। গুরু-শিষ্যের পার্থিব সম্বন্ধ স্থাপন করাই দুরূহ হয়ে ওঠে, বলতে কী!

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ দূরে থাক, শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতাতেই সে নারাজ। প্রেমের মত বইও ঠিক ধরে বেঁধে পড়ানো যায় না। আর বাঁধা-ধরা রাস্তায় চালানো ওকে দায়। একেই তো বিদ্যালাভের কোনো দরাজপথ নেই বলা হয়েছে, তা সত্বেও লোক চলাচলে, বেশীর ভাগ বালকদের চালচলনের ফলে যাও বা একটা গলিপথ তৈরি হয়েছিল, সে পথ দিয়েও সে গলবে না। সেই চলতি পথেও পার্থ 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। সোজা মুখস্থ পথ, গড় গড় করে গড়িয়ে যাওয়া যায়, কোথাও লাগবে না, আটকাবে না, চোট হোঁচোট নেই, তারপর যথাস্থানে যথাসময়ে গড় গড় করে উগরে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেকথা যে কাকে বোঝাই?

সমিতির এক মুখপাত্র উপদেশ দিয়েছিলেন, রোম্যান টাইপে শেখাও। কথাটা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু মুখপাত্ররা বললে কি হবে, পাত্রর মুখ তো তাঁরা দেখেন নি। তাঁদের তো দেখতে হয় না। কেবল রোমান কেন, দেবনাগরি, ওড়িয়া, উর্দু, কোনো টাইপই পার্থর সঙ্গে খাপ খাবার নয়। এক একটা টাইপ আছে যাকে বলে রং ফাউণ্ড, টাইপদের পংক্তিভোজ থেকে অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হয়ে যাদের বাদ দিতে হয়, পার্থ তাদের সগোত্র। একেবারে কোনো প্যারার মধ্যে স্থান পাবার নয়, এক কথায়, অপার্থিব।

এহেন যখন অবস্থা, পাড়ার ডাক্তার তাড়া করলেন আমায়। তিনিও সমিতির একজন। বললেন—"তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের সমিতির এক ছাত্র এসেছিল আমার কাছে—পার্থ তার

নাম। বলছিল, রাত্রে তার ভালো ঘুম হয় না। তোমার শিক্ষাই নাকি তার এই রোগের জন্যে দায়ী। ঘুমোলে শুধু বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি স্বপ্ন ভ্যাখে,—ভ্যাখে যে কিম্ভূত কিমাকার যত লোক তাকে তাড়া করে আসছে।”

“কী ধরনের লোক ?

“তা আমি জানি না।” বললেন ডাক্তার : “তবে সেই লোকগুলো তাকে বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। পার্থ বলে, পুলিসের মার সে সয়েছে, রুল ডাণ্ডায় তার নিদ্রার ব্যাঘাত কখনো হয় নি, কিন্তু বইয়ের এই মার তার অসহ্য। বলছে যে এই ভয়েই সে বিয়ে করল না।”

“বইয়ের সঙ্গে বিয়ের কী?” আমি বিস্মিত হই। বই আর বৌয়ের ভেতর কোনো বৈধ সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না।

“বইয়ে আর বউয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে স্পষ্টই বোঝা যায়”, জানালেন ডাক্তার : “তবে তার বিচিত্র কি! সাত দিন সাত রাত্রি ঘুম হয় নি, পাগলের মত চেহারা, পাগল হয়ে যেতে তার দেরি নেই—দেখলেই বোঝা যায়।”

আমারও পাগল হবার দেরি কোথায়! আমি ভাবি। চুপ করে থাকি।

“অত বেশী লেখাপড়ার চাপ দিয়ো না। স্বাস্থ্য সর্বাগ্রে, জানো তো? তুমি শিক্ষিত না হলেও শিক্ষক মানুষ, শিক্ষাদানের মহৎ ব্রত অকাতরে ঘাড়ে নিয়েছো। তার ওপরে সাহিত্যিক আবার! তোমাকে আর বেশি বলার দরকার করে না বোধ হয়?”

ডাক্তার ছেড়ে দিতেই সমিতির সভাপতি এসে পাকড়ালেন—“কী, কদ্দূর এগুলো? অ আ ক খ লিখতে পারে?”

“না মশাই।”

“লিখতেও জানে না, পড়তেও শেখে নি, তবে কী লেখাপড়া শেখাচ্ছো হে?”

“লেখাপড়া শিখতে ওকে রাজী করতেই একটু বেগ পেতে হচ্ছে

কিনা! তাই একটু দেরি হচ্ছে। তা, ওকে আমি তৈরি করে নেব।”

“হ্যাঁ একটু চটপট নাও। পার্থর মত এমন নিরেট আমাদের পাড়ায় থাকা আমাদের কলঙ্ক। এখানে চাঁদ অনেক আছেন বটে—” বাঁকা চোখের চোখা চাহনিতে তিনি আমার প্রতিই কটাক্ষপাত করলেন বলে মনে হোলো—“কিন্তু এরূপ কলঙ্ক তাঁদের শোভা বাড়ায় না।”

এবার সত্যিই আমার রাগ হোলো। নিজের ওপর, পার্থর ওপর, পৃথিবীর সবার ওপর। এরকম না-পড়ুয়া ছেলে আমি জীবনে দেখি নি! না, এবার আমায় মরীয়া হয়ে লাগতে হবে। অনেক ধেড়ে ছেলে দেখা গেছে, বিদ্যালাভে বেজায় নারাজ, মোটেই সুন্দর ছেলে নয়, বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশলাভের জন্য শিক্ষার সুড়ঙ্গ কাটতে একেবারেই অপ্রস্তুত, কিন্তু তারাও সাইকেল-শিক্ষার বিজাতীয় লোভে পড়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগে পা ডুবিয়েছে। এগুতে এগুতে ক্রমশঃ আপাদমস্তক ডুবে যেতে দেখা যায়। সাইকেল-শিক্ষা, সিনেমা-পাঠ, ফুটবলের মরশুমে গড়ের মাঠ মকসো—এসব কোর্স তো ওই জন্যেই রাখা। কিন্তু আমাদের পার্থ সে পদার্থই নয়। কোনোরূপ বিদ্যাতেই ওর রুচি নেই। কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। শিক্-কাবাব খাইয়েও ওর শিক্ষাভাব দূর করা যায় কিনা, ভুলিয়ে ভুলিয়ে ওকে বিদ্যার বিপথে আনা যায় কিনা, হদ্দমুদ্দ দেখব এবার।

ওর জন্যে যদি নতুন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করতে হয় তাও করতে হবে। পেছপা হলে চলবে না। শ্রুতিলিখন বা দ্রুতপঠনের দ্বারা হবে না। লেখাপড়া এখন নয়, লেখা থেকেই শুরু হোক। প্রথমে ও নিজের নামটা সই করতে শিখুক। নিজের নামে কার না আসক্তি? সেই আসক্তি ক্রমশঃ বেড়ে শক্তিসঞ্চয় করে সুশিক্ষা লাভের দিকে অশ্ববেগে না হলেও, গাধার চালেও যদি দৌড়য় তাই আমরা যথেষ্ট ভাবব। নামসই করতে করতে নামের মোহে—নাম

জাহির করার লোভ ওকে পেয়ে বসবে। তখন চাই কি, এখানে সেখানে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির দেয়ালে, সাধারণ শৌচাগারের গায়ে, মানে সাধারণের সাহিত্য-চর্চার সব আসরেই ওর নাম আমরা দেখতে পাব। কিছু আশ্চর্য নয়! নামের লোভে পাঠক রাতারাতি লেখক হয়, আর লেখক স্বয়ং প্রকাশক হয়ে দাঁড়ায়—পার্থ তো কী ছার!

বাসায় ফিরে দেখলাম, পার্থ মুখ গোমড়া করে বসে আছে।

"আচ্ছা, তুমি নিজের নাম সই করতে পারো ?"

পার্থ ঘাড় নাড়ল।

"কই, করো তো দেখি।" দিলাম খাতা-কলম।

পার্থ একটা জিনিস আঁকলো—অনেকক্ষণ ধরে। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওর কপালের শিরা আর হাতের পেশী ফুলে উঠল—ওই একখানা সই বাগাতেই। সইটা দেখে আমি অবাক! যোগের এক পা-ওয়ালা চিহ্নকে দুপায়ে দাঁড় করালে যা হয় তাই : plus কে into করা হয়েছে।

"এ তো গুণের চিহ্ন! তবে তোমার কোন গুণের চিহ্ন কিনা বলতে পারি না।" আমি বললাম : "একে তো ঢেঁড়া সই বলে।"

তারপর একটা কাগজে 'শ্রীপার্থ' লিখে ওকে দেখালাম—"এই হচ্ছে তোমার নাম। ঠিক এই রকম করে লেখো তো দেখি।"

দেখে ও চমকে উঠল। কাগজখানা ওর কোলে ফেলে দিলাম। লাঠির চোট বাঁচাতে গিয়ে মানুষ যেমন করে হাত তোলে ও ঠিক তেমনি করে কাগজখানা সামলালো।

তবে হয়তো ওটা ওর নমস্কারের ভঙ্গী—তাও হতে পারে।

"আস্তে আস্তে রপ্ত করবে। কোন তাড়াহুড়ো নেই। তোমার সুবিধামত, ইচ্ছেমতন, অবকাশমাফিক একটু আধটু করলেই হবে। যদ্দিনে পারো, এই সইটা বাগিয়ে আনো, কেবল এই তোমার পড়া রইলো, কেমন? আর এ নিয়ে বেশি ভেবো না—শয়নে স্বপনে ভাববার মতো এমন কিছু নয়—স্বপ্নে তো নয়ই। বুঝেছ?"

পার্থ ঢোঁক গিলল। তারপর কাগজখানাকে গুটিসুটি পাকিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলে গেল সে।

একসপ্তাহ বাদে সে এল—পড়া তৈরি করে একেবারে। দেখলাম 'শ্রীপার্থ' সে নিখুঁত করে লিখেছে—আমার হস্তাক্ষরেই যদিও—তাহলেও ঠিক যেমনটি লিখে দিয়েছিলাম—অবিকল! তাছাড়াও তার খাতার আগাপাশতলা পার্থময় দেখা গেল। সব পাতা ভর্তি শুধু শ্রীপার্থ। নামের এই বহর দেখে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না—নাম-মাহাত্ম্য যাবে কোথায়?

"আমার নামটা ইংরেজীতে সই করে দিন না। আমি পড়বো।" অ্যাঁ? বলে কী? পার্থর পড়ায় মন? ওর এই অপার্থিব লালসায় আমার উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তক্ষুনি ওকে নতুন পড়া দিয়ে দিলাম।

এবার তিনদিনে রপ্ত করে পার্থ হাজির। দুখানা পাতা জোড়া ওর নামাবলি একগাল হাসির সঙ্গে খুলে দেখালো।

এম্‌নি করে লেখা পড়ার আমদানি আর রপ্তানি সমান তালে চলল ওর।

এরপর থেকে 'মুর্গি ডিম পাড়ে', 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'কারো পকেট কাটা ভালো নয়' এইসব বড়ো বড়ো কথা ওকে লিখতে দেয়া হল—এবং দেখা গেল ঠিক ঠিক সে লিখে এনেছে—একচুল এদিক-ওদিক হয় নি। বাহাদুর বটে পার্থ।

পার্থর উন্নতির খবর পেয়ে জনশিক্ষা সমিতির সভাপতি সাধুবাদ জানিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন—চিঠিখানা সগর্বে ওর চোখের ওপর মেলে ধরলাম "দেখচ! কী লিখেছেন উনি?"

পার্থ দেখল। দেখে বলল, "এর লেখাগুলো আপনার মত গোটা গোটা নয়। কেমন ইকরি মিকরি। কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে।"

"বাঃ! ইংরেজিতে লিখেছেন যে। দেখচ না।"

পার্থ চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিল—বেশ সাগ্রহেই।—

"আচ্ছা, এই চিঠিখানা আমি পড়ব এবার। বাংলা তো পড়লাম, ইংরিজিটা পড়ি না এবার? দেখি পারি কিনা?"

"পারবে! খুব পারবে। পৃথিবীতে না পারবার মতো কিছু নেই। সমস্তই গাছের ফল—টুপ করে পড়বার অপেক্ষায়। ফলাও হয়ে হাতের নাগালে ধরে রয়েছে—ধরে পাড়লেই হোল।" আমি উৎসাহ দি।

তারপর আর অনেকদিন ওর পাত্তা নেই। চিঠিখানা পড়া (কিংবা পাড়া) ওর পক্ষে সহজ ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই ভয়েই কি সে পাড়া ছাড়ল নাকি?

অবশেষে একমাস বাদে, না পার্থ নয়—তার খবর এল। কোন এক ব্যাঙ্কে সভাপতি মশায়ের সই জাল করে সপ্তম বার টাকা তুলতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে।

সভাপতি মশাই মুখ অন্ধকার করে আমার কাছে এলেন—"এই তোমার কাজ? জনশিক্ষার নামে দুর্জনশিক্ষা চালানো হচ্ছে? পাড়ার সবাইকে জালিয়াতি করতে শেখাচ্ছো? বটে? তোমাকেও পুলিসের ধরা উচিত। তুমিও পুলিসের অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে। ধরে কিনা দেখা যাক।"...শুনলাম, কিন্তু কিচ্ছু বললাম না।

শুনে গুম্ হলাম।

কিন্তু পার্থ বলল। আমার কাছ থেকেই তার শিক্ষালাভ, সে কথা সে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করল। কোনো কথাই সে অস্বীকার করল না। ওর পাঠ্যপুস্তক—সভাপতির স্বাক্ষরিত সেই চিঠিখানাও সে থানায় দাখিল করেছে। আর বলেছে, "আমি লিখতে জানি না। একদম না। তবে কেউ কিছু লিখে দিক"—বলতে বলতে নাকি তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শোনা গেল—"আমি তার ঠিক নকল করে দেব।"

এবং তার এই কবুলতির তলায় সে নিজের নাম সই করেছে—ঢেঁড়া দিয়ে।...সেটা আমাদের গুণের চিহ্ন—তার এবং আমার দুজনের গুণপনা মিলিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

সাহিত্যিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ স্বর্গত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কবরেজখানায়। তিনি কবিরাজ হিসেবে যেমন নামজাদা ছিলেন, লেখক হিসেবেও তেমনি স্বনামধন্য। তাঁর মত বন্ধুবৎসল ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না।

তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ প্রায় লেখকই যেতেন তাঁর আড্ডায়। বিভূতিবাবুও যেতেন। আমার এক মামার বাসা ছিল তার ওপরতলায়। আমিও নীচুতলার উক্ত উচ্চব্যক্তিদের মজলিশে উঁকি-ঝুঁকি মারতাম মাঝে সাঝে।

একাধারে তাঁর কবরেজখানা আর সাহিত্যিক আড্ডা ছিল মুক্তরামবাবু স্ট্রীটের মোড়টাতেই। কল্লোলের আড্ডার মতই স্মরণীয় সেই আড্ডা।

বিভূতিবাবু শুধু সাহিত্যব্রতী নন, শিক্ষাব্রতীও আবার। একাধিক ইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন বলে শুনেছিলাম। লেখাপড়ায় তাঁর কাছে আমার হাতে খড়ি না হয়ে থাকলেও লেখাপড়ানোর ব্যাপারে তাঁর কাছেই প্রথম আমি প্রেরণা পাই। সাহিত্যব্রতে তাঁর কাছে দীক্ষা না পেলেও শিক্ষণব্রতের শিক্ষালাভ আমার তাঁর কাছেই। এটি সেই পর্বেরই কাহিনী আমার…

'মাস্টারি? মাস্টারির কথা বলছ? মাস্টারির কথা আর বোলো না।' আমি বললাম আমার বন্ধুকে।

এখনো আমি ইস্কুলের স্বপ্ন দেখি, সে কথা সত্যি। বই বগলে পড়তে যাচ্ছি, বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে আছি, মাস্টারের হাতে কানমলা খেতে হচ্ছে—সময় সময় সতীর্থদের দক্ষিণ হস্তেও—এসব দৃশ্য দেখি এখনো। এবং এসব আমার কাছে সুখস্বপ্ন।

কিন্তু—কিন্তু মাস্টারির স্বপ্ন আমি কখনো দেখি না।

মাস্টারি কদাচ করি নি যে তা নয়। একবার করতে হয়েছিল

কিছুদিনের জন্য, ব-কলমে যদিও। বন্ধুর কাছে বিভূতিবাবুর নামোল্লেখ করি নি, তাতে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও হয়তো বা মানহানি হত তাঁর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার কাছে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।···শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে কি কারো ভালো লাগে ? যে কেউ বলুক !

'বেশ কিছু ভালো বেতন কিন্তু।' অনুরোধের উপর উপরোধ।

'যতো টাকাই দিক, প্রাণ থাকতে আর না।' আমি শিউরে উঠি।

'দশ বছর মাস্টারি করলে গাধা হয়ে যায় বলে। সেই ভয়েই বুঝি—?' বন্ধুর মধ্যে বন্ধুরতা দেখা দেয়। '—নাকি অন্য কিছু ?'

'গাধা হয় কি না জানিনে, তবে ছাত্র হয়ে যেতে হয়—সত্যি। আমাকে তো মাত্র দশ দিনেই ছাত্রত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল—কিন্তু সেজন্যে নয় '

'এর আগে মাস্টারি করেছিলে বুঝি কখনো ?' বন্ধু বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ' করতে হয়েছিল। একবার' একজনের একটিনি। আমার জীবনে সেই প্রথম আর সেই শেষ।'

আমার সেই একটিনির কথায় বিভূতিবাবুর নামটাকে আর টানি নি।

'কিন্তু শিক্ষাদান তো মহাব্রত।' বন্ধু তথাপি ছাড়েন না।

'তা জানি কিন্তু শিক্ষা দিতে গিয়ে যে বিব্রত হতে হয়। সহজ নয় শিক্ষা দেয়া, সে কথাও আমার জানা আছে। শিক্ষা দিতে গিয়ে উল্‌টে শিক্ষা পেয়ে আসতে হয়। আর সত্যি বলতে' শিক্ষা লাভ করতে আমার আদৌ ভাল লাগে না। সেই আমার ছেলেবেলার থেকেই।

'সেই কারণেই তুমি বনেদী শিক্ষক হতে পারতে। শিক্ষালাভে যাদের অরুচি তারাই তো শেখায়। তোমার বনেদ বেশ পাকা ছিল হে।' বন্ধু বলল : 'তোমার আপত্তির কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়। কি হয়েছিল মাস্টারি করতে গিয়ে জানতে পারি ?'

'সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। শুনবে নিতান্তই?—তাহলে শোনো।...

আমার এক বন্ধু ছিলেন স্কুলমাস্টার। অসুখে পড়ে আমাকে তাঁর বদলি দিয়ে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। অসুখের মধ্যেও এতটুকু সুখ মাস্টারদের সয় না—তাদের অদৃষ্টই এমনি। এমনি সাবু তাকে দিতে পারো, কিন্তু তার সঙ্গে যদি একটু মিছরি মিশিয়ে দাও তাহলেই তার হয়ে গেছে। সেই মিছরিটুকুই তার বরাতে ছুরি হয়ে দাঁড়াবে। কাল হবে তার।

ছুটি বলে মাস্টারদের কিছু নেই। দশটা পাঁচটা স্কুল তো আছেই—তার ওপরে এবেলা ওবেলা টিউশনি। সকাল সন্ধ্যা—সমান ছুটোছুটি। বিকেলেও বাদ নেই। ভ্যাকেশানেও ছুটি নাস্তি। রেহাই কে দেয়? মরবার আগে মাস্টারদের ছুটি হয় না এমনি কি, ছুটি পেলেই তারা মারা পড়ে। আমার বন্ধুটিও বোধ হয় এই কারণেই দিন দশেক ছুটি উপভোগ করতে না করতেই আমার মাস্টারি পাকা করে দিয়ে ইহলোক এবং সেই স্কুলের যত বালকের মায়া কাটালেন।

মাস্টারি পাকা হলে কি হবে, মাস্টারির ব্যাপারে আমি নেহাত কাঁচা ছিলাম। পাকা মাস্টার যে কখনো দেখিনি তা নয়—পঠদ্দশায় দেখেছি, শিক্ষকদশাতেও দেখলাম। সেই স্কুলেই দেখা গেল—বেশ পাকা-পোক্ত শিক্ষক। অনেক ভালো ভালো লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন—একেবারে ঘুণ! একথা আমি জানি। তবুও আমি যে তাদের পাকচক্র কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি সেজন্যে আমার আহ্লাদ—আল্লাকে ধন্যবাদ।

কেবল মাস্টাররাই না, পড়ুয়াদেরও বেশ পাকা পাকা বলতে হবে। এই দোরোখা পরিপক্কতার প্যাঁচে পড়ে যে অভিজ্ঞতা—যে অমানুষিক শিক্ষালাভ আমি করেছি তা কহতব্য না—তুমি কি নিতান্তই তা শুনতে চাও?—

নেহাৎ না শোনালে না যদি ছাড়ো তো শোনো। আমার কিন্তু

সে দুঃখ কাহিনী কাউকে বলার উৎসাহ হয় না। জানো তো, স্কুলের আমার যা বিদ্যে তাতে ভাল ছাত্র কোনোদিন আমায় বলা চলত না, তবুও তারই দৌলতে মাস্টারিটা বোধ হয় ভালোই চালিয়ে নেব, এইরূপ আমার ধারণা ছিল। বিদ্যার বহর তো বলদের মত ছেলেরাই বয়ে মরে; আমাদের শুধু হেট্ হেট্ করলেই হয়। এবং তারা তো বইয়ের চাপে হেঁট হয়েই রয়েছে। এই হেতু ছাত্র হওয়ার পক্ষে যা কিছুই নয়, শিক্ষক হওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট, এমনকি, গুরুতরও বলা চলে। ছোটরা তো বড়োদের পড়া ধরতে পারে না—এই এক মস্ত সুবিধে। অতএব কাজটা আমার পাকাপাকি হতেই কোমর বেঁধে লেগে গেলাম।

বলেছি তো, পড়ুয়ারা বেশ পাকাপোক্ত। অনেকেরই দাড়ি গোঁফ বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ বয়সে আমার বড়। অনেকে আবার ছেলের বাবা। অমন চক্ষু বিস্ফারিত কোরো না, ওতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, তিন যুগ আগের কথাই বলছি। তখন কারো কারো সৌভাগ্যে বাল্যপাঠ ও বাল্যবিবাহ এক সঙ্গে শুরু হত—ষোলো বছরে পা দেবার পর। চাণক্যের উপদেশমত, পাঁচ বছর পর্যন্ত আদুরে থেকে, দশ বছর বাপ মা খুড়ো জ্যাঠার তাড়না সহ্য করে ষোলো বছরে একেবারে পাঁঠা বনে পঠদ্দশালাভ! মাথার দিকে না হলেও পায়ের দিক দিয়ে দ্বিজত্ব লাভ—চারপেয়ে হয়ে পায়াভারী হয়ে যাওয়া। বই এবং বউ—দুরকম পাঠ্যই একসঙ্গে—সিস্টেমটা কিছু মন্দ ছিল না। যাই হোক, আমার একটু মুশকিল হল, ওরা আমায় মানবে কি, উল্টে আমাকেই ওদের মান্য করে সমীহ করে চলতে হত।

তবু চালিয়ে নিয়েছিলাম। আমি লেখক বলে আমাকে ওঁরা বাঙলার মাস্টার করে দিয়েছিলেন। লেখক হওয়া সত্ত্বেও যতগুলো বাঙলা বানান আমার নির্ভুল জানা ছিল, তাদের পড়াতে পড়াতে প্রায় সবই তার আমি ভুলে গেলাম। এক-একটা শব্দের যে কতদূর সম্ভাবনা আছে, কতগুলো বানান হতে পারে, তা এগজামিনের খাতা

না দেখলে জানা যায় না। এক পৃখিবী বানানই আমি আট রকমের দেখেছি—প্রত্যেক ছেলের মাথাতেই পৃথিবী বানাবার স্বতন্ত্র আইডিয়া। তুমি যদি পৃথিবীর বানান ফট করে আমায় জিজ্ঞেস কর আমি চট করে হয়ত বলতে পারব না। আদি যুগের সেই মাস্টারির কৃপায় আমার ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

তবু, এত বোঝা বওয়াও আমার পক্ষে ভারী ছিল না, বোঝাতেও বেশ পারতুম, কিন্তু মুস্কিল বাধলো বুঝতে না পারায়। সেটা আমার দিক থেকেও বটে, ওদের দিক থেকেও বটে! উভয়তই এই মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা ঘটল, এবং ঘটতে লাগল ক্রমান্বয়ে। খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মধ্যে যেমনটা খোঁচাখুঁচি একদা ঘটেছিল নাকি! দুজনে কেহ কারে বোঝাতে নাহি পারে, সমস্ত বোঝার ওপরে খচিত হয়ে এই শাকের আঁটিটাই সব চেয়ে বেশি বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল—উটের পিঠের মারাত্মক শেষ কুটোটির মতন তেমনি শোকাবহ।

কর্মধারয় জিনিসটা কী, ওদের প্রশ্নের জবাবে একদিন আমি বোঝাচ্ছিলাম। বলেছিলাম যে ওটা যা তা কথা নয়, গীতার কথা। কথাটা কর্মধারয় নয়, কর্মের ধারা। তবে সংস্কৃত করে বহুবচনে কর্মধারয় হয়তো বলা যায়—আমি ঠিক বলতে পারব না—তোমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কোরো। আসল কথা হচ্ছে, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই বলে আঙুল নেড়ে গীতার স্বকপোল কল্পিত সমুহ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, ওরা একযোগে ঘাড় নাড়তে লাগল।

'তা না সার।' সকলের মুখে এক বাক্য।

'তাহলে ধার করাই যাদের কর্ম তারাই হচ্ছে কর্মধারয়—' বলে স্বরূপ, যেমন আমি, এই বলতে যাচ্ছি—বাধা পেলাম আবার।

'তা না সার।' ভদ্র বালকদের সেই এক কথা।

'তা নয়, তবে কী? জিজ্ঞেস না করে পারি না।

তবে যে কী তার উত্তর না দিয়ে, বোধ হয় আরো বেশি ওয়াকি-

বহাল হবার উদ্দেশ্যেই ওদের একজন প্রশ্ন করে বসলো—'তাহলে দ্বন্দ্বটা কী, বলুন তো।'

'দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব হচ্ছে খুব খারাপ।' আমি বললাম। একটুও গোপন করলাম না।—'এবং সর্বদা দেখবে দ্বিধার সঙ্গে জড়ানো থাকে। কথায় বলে দ্বিধা দ্বন্দ। কখনো শোন নি?'

কখনো যে শুনেছে ওদের হাবভাবে এরূপ আমার বোধ হল না। ওরা বলল, দ্বন্দ্ব একটা সমাস।

আশ্চর্য নয়। এই ধরনের কথাটা আমিও যেন কোথায় শুনেছিলাম। কোথায় আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। দ্বন্দ্ব যে কেবল সমস্যা নয়, সমাস হওয়াও সম্ভব, আমার মনের কোথায় যেন এ-সন্দেহটা বদ্ধমূল ছিল—নাড়া পেতেই সেখান থেকে সাড়া এল। কিন্তু তাহলেও, হাজার কৌতূহল হলেও সমাসটা যে কী বস্তু, সে কথা তো আর ওদের কাছ থেকে জেনে নেয়া যায় না। যাই হোক, জিনিসটা ভারী খারাপ। ওর ধারে-কাছেও তোমরা থেক না। তা সত্ত্বেও আমার শেষ কথাটা বলে দিই: 'ঐ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব সময় এড়িয়ে চলবে।'

'আচ্ছা, তদ্ধিতটা কি সার?' সামলাতে না সামলাতে আবার এক সাঁড়াশি আক্রমণ।

'বোধ হয় আরেকটা সমাস?'

'উহুঁ। তদ্ধিত হচ্ছে প্রত্যয়।' তারা বললে। একযোগে আর সমস্বরে।

অবশ্যি তারা বললেই যে আমাকে প্রত্যয় করতে হবে তার কোন মানে নেই।

কিন্তু আমি আর কথা না বাড়িয়ে, এর ওপর ফের বহুব্রীহি আর ষষ্ঠী তৎপুরুষ—সেরকম ঝামেলা আসতে পারে কেমন যেন আমার আশঙ্কা হচ্ছিল—তার আগেই ক্লাস থেকে উঠে এলাম। আমার মধ্যপদ লোপ করে সেদিনকার মতন কর্মধারায় ইস্তফা দিয়ে এসে

সটান বাড়ি ফিরে ব্যাকরণ নিয়ে পড়লাম। ইস্কুলের অত বছরে যার তিন পাতাও সারতে পারি নি, তার আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে আর এক রাত্রে সারা করলাম।

কিন্তু ভেবে ছাখো, এত হাঙ্গামা করে ছেলে পড়ানো পোষায় না। আজ ব্যাকরণ, কাল টেক্সট, পরশু মানের বই, তার ওপরে অভিধান, এই সব পড়ে—পড়ে পড়ে আর মুখস্থ করে প্রত্যহ যদি ওগলাতে হয়, তাহলে ফের কেঁচে গণ্ডুষ করে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেই পারি—মাষ্টার হয়ে আবার পড়াতে যাওয়া কোন্ দুঃখে?

তাছাড়া, কেবল ইস্কুলেই নয়, ইস্কুলের বাইরেও বেশ ঝক্কি। রাস্তায় ঘাটে পথে বিপথে কলকাতার অলিতে গলিতে আমার ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানেই যাই, যেদিকেই পা বাড়াই, কেউ না কেউ সামনে এসে পড়ছে—আর 'নমস্কার স্যার' শুনতে হচ্ছে আমায়। হয়তো এক জায়গায় স্থির হয়ে একটুখানি আলুকাবলি খাচ্ছি অমনি একজন সম্মুখে এসে দাঁড়াল: 'নমস্কার স্যার'।

ভদ্রতার খাতিরে—যদিও শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে ভদ্রতার সম্পর্ক নয় ঠিক—তাহলেও আমার ভাগ থেকে একটু দিতেই হয়। 'চাখবে নাকি? নাও একটু?'

আলুকাবলি খাওয়া যে অতি গর্হিত এবং খেলে পেট কামড়ায়, ছেলেটার ভাবখানা যেন এইরকম। তবুও নেহাৎ আমি সাধছি, আর আমি নাকি গুরুজন, আর গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই, সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে ওর একটু হাত পেতে নেওয়া। এবং তারপরেই আমাকে চীনেবাদাম কিনতে সে উদ্বুদ্ধ করে—'ওগুলোও খেতে বেশ স্যার।'

আরে, তা কি আর আমি জানিনে? চীনেদের চেনবার আগে থেকে আমি চীনেবাদাম চিনেছি, চিবুতে চিবুতে বলে কি, বুড়ো হয়ে গেলাম! তবে কিনা ছেলেটি চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম—এই মাত্র। কিন্তু গুরু শিষ্য সম্বন্ধ যে এতদূর অচ্ছেদ্য হতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল?

এইভাবে কি সিনেমায় কি রেস্তোঁরায় কি হেদোর ঘাটে হাওড়ার হাটে কিম্বা আর কি ফুটবলের মাঠে ছাত্রদের সাথে টক্কর খেয়ে খেয়ে আরো আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। বারম্বার নমস্কার স্যার শুনতে হলে মানুষের সার ভাগ আর কতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে? ওদের সারাংশের মর্যাদা রাখতে আমার জীবন আর পকেট দুই অসার হয়ে উঠল। কী-ই বা বেতন পেতাম, তার ওপর ওদের খাইয়ে আর সিনেমা দেখিয়েই ফতুর হবার দশা হল। আর কী চেনাটাই ওরা আমায় চিনেছিল। আমি ওদের অনেক সময়ে চিনতে না পারলেও ওরা আমায় ঠিক চিনে নিত—কি করে পারত জানিনে। আমি মোটে দুটি ক্লাস পড়ালেও, গোটা ইস্কুলটাই যেন আমার ছাত্র হয়ে গেছল। এবং তারা বোধ হয় কেউ বাড়িতে বসে সময় নষ্ট করত না। ঠিক যে আমার অপেক্ষাতেই পথে পথে ওৎ পেতে থাকত তা অবশ্যি আমি বলতে চাইনে, তবু রাস্তাটাই যেন ওদের একমাত্র আস্তানা, এক এক সময়ে এমন সন্দেহ আমার না হত যে তা নয়।

বেশি কি বলব, এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র ওদের ভয়েই এতটা বয়স পর্যন্ত চরিত্র-স্খলনের আমি সুযোগ পেলাম না। আমাকে সচ্চরিত্র থেকে যেতে হল অনিচ্ছাসত্ত্বেও—এক রকম বাধ্য হয়েই। ইচ্ছে থাকলেও যথোচিত পথে পা বাড়াবার কোনদিন আমার সাহস হল না। কি জানি, সেদিকেও যদি কারো গতিবিধি থাকে—তার গায়ে ধাক্কা লাগে আর অমনি সে করজোড়ে বলে ওঠে, নমস্কার স্যার, তাহলেই তো হয়েছে। এবং আমার প্রাক্তন ছাত্ররা কলকাতার, কোথায় নেই বলুন? যদিও তাদের অনেকেই এখন মাস্টার কিম্বা অধ্যাপক কিম্বা কালোবাজারী হয়ে গেছে তাহলেও আমার তো ছাত্রই! আর, আমি তাদের চিনতে না পারলেও—এখন তো চিনে ওঠা আরো কঠিন—তারা আমায় ঠিক চিনে রেখেছে। তাদের হাতে নিস্তার নেই।

বার্ণাডশ বলেছেন, যারা কোকেন খায় নি আর ইদিকে-সিদিকে

এক-আধটু গতিবিধি করে নি, তারা নাকি এযুগের নাগরিক রূপে গণ্যই নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুল করে কবে একবার মাস্টারী করেছিলাম বলে উভয়বিধ কোকশাস্ত্রই এ জীবনে আমার অজানা থেকে গেল। লক্ষ্যলাভ করে মোক্ষলাভ আমার হল না। ভয় হয় আবার হয়তো আমায় জন্মাতে হবে। সাধ রয়ে গেল, কিন্তু স্বাদ রইল না—এই জন্মেই—কিন্তু উপায় নেই, বেশ বুঝতে পারছি।

আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। বলেন বন্ধু—'কেন, কোকেন তুমি এখনো খেতে পারো। সে সুযোগ তোমার যায় নি। লজ্জা করলে, বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে খেয়ো, কেউ টের পাবে না।'

হ্যাঁ, ঐ সম্ভাবনাটাই এখনো আছে। তবে জানো কি বন্ধু, অর্ধেক মনুষ্যত্বে—আধখানা মানুষ হয়ে লাভ নেই। উপনিষদ বলেছেন, নাল্পে সুখমস্তি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি উপস্থিত করি।

'দুঃখের কথা থাক। তোমার মাস্টারির কথা বল।'

'তাইতো বলছি হে! তবু ছেলেদের নিয়ে কেটে যাচ্ছিল কোনরকমে। আলুকাবলি চীনেবাদাম ফুটবল মাঠের অকস্মাৎ দর্শনী পেয়ে পেয়ে আমার ব্যাকরণ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনদিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি, ইস্কুলের হাইকম্যাণ্ডের কাছেও কিছু বলে নি, আমার বিপক্ষে তাদের কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। অন্যান্য শিক্ষককে তারা যেমন নাস্তানাবুদ করত বলে শোনা যেত, আমাকে কখনো সেরূপ বিপাকে ফ্যালে নি। বরং আমাকে তারা একটু যেন স্নেহের চক্ষেই দেখত, এখন আমার মনে হয়।

আমার কাছ থেকে নিয়মিত নাস্তা পাবার দরুণই হয়তো হবে, আমার সাহচর্যের নেশায় তারা যেন কেমন বুঁদ হয়ে থাকত। আমার ফাঁকির বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়ে দেয় নি কোনদিন। আমাকে নাস্তানাবুদ হতে হয় নি কখনো।

তবু মাস্টারিটা আমার টিকল না। মেয়েদের শত্রু যেমন পুরুষরা নয়, মেয়েরাই আসলে—তেমনি ছাত্ররা নয়, মাস্টাররাই হচ্ছে

মাস্টারের দুষ্‌মন। জনৈক মাস্টারের জন্যই মাস্টারিটা আমায় ছেড়ে দিতে হল···শেষপর্যন্ত।'

"হেডমাস্টার বুঝি?" জিজ্ঞেস করল বন্ধু।—'একদিন ক্লাসে এসে তোমার পড়ানোর পরীক্ষা নিতেই তোমার বিদ্যে বুদ্ধি সব ফাঁস হয়ে গেল? ধরা পড়ে গেলে শেষটায়?'

'না, সেরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। হেডমাস্টার অতি উপাদেয় ছিলেন—অমন লোক হয় না। বলতে কি, সব ক'টি মাস্টারই খাসা, কেবল একজন বাদে। ভদ্রলোকের নাম এখন আমার মনে নেই। তাঁকে আমরা গড়গড়ি বলতাম।

গড়গড়ি ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। প্রৌঢ় মানুষ, হেডমাস্টারের চেয়েও বয়সে ভারি। বিলকুল সেকেলে লোক। কী রকমের যেন! কিছুতেই তাঁকে একটা কথাও আমি কওয়াতে পারি নি। কিছুতেই না।'

'লাজুক প্রকৃতির বোধহয়?'

'আমিও তাই ভাবতুম। বলতে কি, লোকটা আমার বেশ ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল! এমন অমিশুক লোক আমি জীবনে দেখি নি। মাস্টারদের বসবার ঘরে তাঁর টেবিলে তাঁর মুখোমুখিই আমায় বসতে হত। আর, এমন খারাপ লাগত আমার! মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে অথচ কারো একটা কথা নেই।

আমি কথা কইবার কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বৃথাই, গড়গড়ি একদম স্পীকটিনট। গায়ে পড়ে ভাব করতে গেছি, কিন্তু গড়গড়ি গায়েই মাখে না। আমলই দেন না আমায়। উচ্চবাচ্য করা দূরে থাক, নমস্কার করলে প্রতি নমস্কার পর্যন্ত জানায় না। এহেন দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য ব্যক্তি জগতে অতি বিরল।

অবশেষে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। নিজমনে বললাম, আমার আর গড়াগড়ি দিয়ে কাজ নেই, গড়গড়ি, তোমায় আমি গড় করি। তুমিও যদি চুপচাপ থাকো তো আমিও চুপচাপ, তোমার সঙ্গে কথা

না বললে যে আমার ভাত হজম হবে না তা নয়। কেউ সেধে কথা বলবার জন্য মাথার দিব্যিও দেয় নি আমায়।'

'অজান্তে হয়তো গড়গড়ির কোমল প্রাণে তুমি ব্যথা দিয়ে থাকবে কখনো?' বন্ধু আন্দাজ করেন।

'আমারও তাই মনে হত; কি করে তা হতে পারে তাই আমি ভাবতুম। কিন্তু ভেবেও যেমন কুল পাই নি, ভাল করে ভাববার সময়ও ছিল না। একে তো সকালে উঠেই ইস্কুলের পড়া করতে হত—'

'ইস্কুলের পড়া?" বন্ধুর চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে ওঠে।

'বাঃ, ইস্কুলের পড়া করতে হবে না? পড়ানো কি চাট্টিখানি নাকি? আমাকে আবার দুদিনের পড়া সারতে হত—যে পড়া কাল দিয়েছি আর যা কালকের জন্য দেব—দুদিক বজায় রাখতে হত আমায়। আর সে পড়া কি কম? ব্যাকরণ, অভিধান, মানের বই—সব মুখস্থ—একেবারে জিহ্বাগ্রে।'

'মনে থাকত সব?'

'থাকলে তো বাঁচতুম। ছোটবেলায় পড়া ফাঁকি দেবার জন্য এক এক সময় দুঃখ হত, কিন্তু না দিলেই বা কি, এতদিনে ভুলে মেরে দিতাম ঠিক! মস্তিষ্ক তো আমার কোনদিনই বর্ধমান নয়, বরং চব্বিশ পরগণা। মেমরি স্টেশনই সেখানে নেই। তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করতাম—যতটা পারি। তারপর, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। পড়াশোনা সেরে, নেয়ে টেয়ে, নাকে মুখে গুঁজে ইস্কুলে পৌঁছতে প্রায়ই লেট হয়ে যেত। বিশ্রাম ঘরে আমার বসবার জায়গায় গিয়ে হাঁপ ছাড়বার আগেই দেখতাম গড়গড়ি নিজের ক্লাসে চলে গেছেন। তারপর তিনি এসে চেয়ারে বসতে না বসতেই আমার ক্লাস। কেবল টিফিনের সময়টুকু যা আমরা একটু মুখোমুখি হতাম। কিন্তু এর মধ্যে কখন যে আমি ওঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারি আমি তো ভেবে ঠাওর পেতাম না। যাই হোক, এইভাবে মুখভার করে তো দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন কালো মেঘের ধার ঘেঁষে রুপালী পাড় দেখা দিল।'

'গড়গড়ি হাসল ?'

'হাঁ। হাসলই বলা যায়। মাস দেড়েক তখন আমার মাস্টারি চলছে। সেদিনও লেট হয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটছি, ইস্কুলের মোড়ের কাছটায় পৌঁছে দেখি, গড়গড়ি দাঁড়িয়ে। প্রশান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে, কোন তাড়া নেই। আমাকে দেখে তিনি একটু হাসলেন। সে হাসিতে বন্ধুবাৎসল্য কিম্বা অপত্যস্নেহ কী প্রকাশ পেয়েছিল আমি জানি না।

তাঁর হাসি দেখে নিজের তাড়ার জন্য আমার লজ্জা হল। আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনো আমার ধারণা হয় নি যে, আমার জন্যই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আমার ছাত্ররা যেমন কলকাতার সর্বত্র মোড়ে মোড়ে মরীয়া হয়ে অপেক্ষা করে তাঁরও প্রায় সেই দশা দাঁড়িয়েছে তখনো আমি ধরতে পারি নি।

কেবল হাসিই নয়, কুশল প্রশ্নও আবার!—'এই যে, শরীর বেশ ভালো ? গড়গড়ির মুখ থেকে শুনতে হল আমায় স্বকর্ণে। আর কী স্নেহবিগলিত সুর। আমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথা, তবু কি করে জানি না, খাড়া রইলাম ঠায়।

'লোকটা লাজুক প্রকৃতির ছিল আমার মনে হয়।' টিপ্পনী কাটল বন্ধু: 'লজ্জার বাঁধ ভাঙতেই এতদিন লাগল তার।'

'আমারো তাই মনে হল তখন। আমি মনে মনে বললাম—আমার এতদিনের ধারণা তাহলে ভুল। ভদ্রলোক সত্যিই সদাশয় কেবল লজ্জার বাধাতেই এতদিন মুখ খুলতে পারেন নি। আজ এতদিন বাদে আমাকে একান্তে বিরলে পেয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। তারপর কুশল প্রশ্ন সেরে যখন তিনি আমার গলা জড়িয়ে ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলেন, তখন আমার বিস্ময় কোন চূড়ান্তে গিয়ে ঠেকেছে তুমি আঁচ করতে পারবে!

গড়গড়ি স্নেহভরে আমাকে টেনে নিয়ে বলতে বলতে চললেন—'একটা কথা তোমাকে বলব ভায়া—কিছু যদি মনে না করো—' চলতে চলতে বললেন।

গড়গড়ি কথা বলছে—আমার সঙ্গে? গড় গড় করে বলছে—অবাধে এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে…নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পারলেও কথাগুলো কানের কাছেই গড়াতে লাগল আমার।

'না, না, কী মনে করব! মনে করাকরির কী আছে?' আমি গদগদ হয়ে গেলাম: 'কিছু আমি মনে করি নি। ভেবে দেখলে এই ইস্কুলে আপনি বহুদিন রয়েছেন, আপনি একজন প্রবীণ শিক্ষক। আর আমি হালের আমদানী। আপনার সঙ্গে আমার ঠিক সমান তালের সম্পর্ক তো নয়। তা আমি বুঝতে না পারি তা নয়। এবং সেই কারণেই আমি কোনদিন কিছু মনে করি নি। আপনিও কিছু মনে করবেন না, এই আমার অনুরোধ।'

'না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু মনে করি নি'—গড়গড়ি বললেন।

'হ্যাঁ, তাই। তাই বলছিলাম। ও নিয়ে কিছু মনে করবার নেই। তারপর আজ যখন আমাদের ভাব হয়ে গেল, হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হল, তখন আজ থেকে সে কথা অতীতের কথা। আপনিও সে কথা ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।

এই বলে আমিও গড়গড়িকে—এক হাতে যদ্দূর নেয়া যায়—জড়িয়ে ধরলাম। তবে আমার আলিঙ্গন তেমন জোরালো হল না, বলাই বাহুল্য।

মোড় থেকে ইস্কুল কাছেই। কাজেই জড়াজড়ি করে যাবার বেশি পথ এবং ফুরসৎ ছিল না। তাছাড়া জর্জরিত হয়ে গড়গড়িকে যেন একটু বিমনা দেখা গেল, কেমন যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।'

'আবার সেই পুরোন লজ্জাটা ফিরে দেখা দিল বুঝি?' জিজ্ঞেস করল বন্ধু।

'না, ঠিক ব্রীড়াবনত নয়, তবু কেমন যেন সঙ্কুচিত। আমার দিক থেকে এতখানি উৎসাহে একটু যেন হক্‌চকানো। ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের অবস্থা আর কি! যাই হোক, আমরা পায়ে পায়ে

ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলাম। ওদিকে গির্জার ঘড়িতে এগারোটা তখন বেজে গেছে। আমিই বকতে বকতে চলেছি—গড়গড়ির কোন বক্তব্য নেই। তাঁর মুখে কোন কথা নেই আর।

'তোমার বিহ্বলতায় বোধ হয় বোবা মেরে গেছেন?' বন্ধু মন্তব্য করেন।

আমার তাই মনে হল। ভাবের গোড়াতেই এতটা ভাবাতিশয্য হয়ত ভাল হয় নি, আমি ভাবলাম। ঐটুকু পথ আর আমাদের কোন কথোপকথন হল না: শুধু আমিই কথা কইলাম আর উনি আমার জবাবে কেবল দু-একবার হুঁ-হাঁ করলেন মাত্র। তারপর ইস্কুলের গেটে পা দিয়েই তিনি ধাঁ করে ফিরে দাঁড়ালেন—গির্জার ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার।

'ঐ যাঃ! লেট হয়ে গেল আজকে।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গড়গড়ি:

'আজ পঁচিশ বছর এই স্কুলে মাস্টারি করছি, একদিনের জন্যও আমার লেট হয় নি।'

'বলেন কি মশাই? আমি চমৎকৃত হই: 'এ ত দস্তুরমতন একটা রেকর্ড মশাই। আমি তো এই মাস দেড়েক মাত্র কাজ করছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমার অন্তত দিন বিশেক লেট হয়ে গেছে।' বলতে কি, আমার রেকর্ডটাকে বিশেষিত করে একটু খাটো করেই বলতে হল।

আমাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিদান করে এবং নিজেও বিমুক্ত হয়ে তাঁর হাতটা আমার কাঁধে তিনি রাখলেন—'আমি তা জানি। এবং ...এবং এই কথাটাই—'

আমতা আমতা করে তিনি বললেন: 'এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাইছিলাম।'

॥ ছয় ॥

আমাদের বাস-তুতো ভাই অ্যাণ্ড কোম্পানি ডকে উঠে যাবার পর, কিছুদিন বাদেই আবার আমাদের মাথায় ব্যবসার ফন্দি মাথাচাড়া দিল—ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল আবার।

এবারকার বুদ্ধিটা ভোলানাথের। কিন্তু এরকম বেয়াক্কেলে বুদ্ধি আর হয় না, বলতে আমি বাধ্য। সত্যি, সেই বাসের কারবারের চেয়েও ঢের বেশি অবাস্তব।

আমি বললাম, 'ব্যবসা তো করবি, কিন্তু তার মূলধন কই রে? টাকাকড়ি সব তো সেই বাসের ব্যবসাতেই খোয়াতে হয়েছে আমাদের।'

তার ওপর আরো খোয়ার হবার পথ আমি দেখি না।

'আমাদের এক মাসতুতো ঠাকুর্দা···' বলছিল ভোলানাথ।

'কী বললি? কী রকমের ঠাকুর্দা?' জিজ্ঞেস করল শৈলেশ।

'আমার মাসির বাবা আর কী!' জানালে সে।

'সে তো তোর মা-রও বাবা রে! দাদামশাই বল তাহলে!'

'ওই হল। তিনি, বর্মা মুলুকে টিকের ব্যবসাতে বিস্তর টাকা কামিয়ে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। দেশে মানে এই কলকাতাতেই। আহিরীটোলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি আছে, সেইখানেই উঠেছেন এসে।'

টিকের ব্যবসায় বড়লোক?' অবাক হয় শৈলেশ।

'ঠিক বলছিস? আমিও কম অবাক হইনে।

'সত্যি না তো কী! বার্মায় গিয়ে টিকের ব্যবসায় বহুত লোক ধনকুবের হয়ে গেছে—কে না জানে।'

'ব্যবসায় টিকে থাকাই বলে শক্ত।' আমি বললাম—'দেখলি না, টেকা দূরে থাক, দাঁড়াতেই পারলাম না আমরা।'

'এ বাসের ব্যবসা নয় রে ভাই, টিকের ব্যবসা। বলছিনে? বলল।

'ভোলানাথ টিকে-তামাকের ব্যবসায় বড়লোক?' আমার বিশ্বাস হতে চায় না আদৌ, 'তবে হ্যাঁ, ব্যবসায় টিকে থাকতে পারলে হতে পারে। সব ব্যবসাতেই হওয়া যায় হয়তো—টিকে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত।'

'আরে দূর!' বলল সে, 'তামাক টিকের ব্যবসা না রে! যে-টিকে দিয়ে হাম-বসন্ত আটকায় তা না—যা দিয়ে কল্কে ধরায় তাও না। আর পণ্ডিতমশাই শ্লোক ঝেড়ে 'টিকা লিখহ' বলে যে ব্যাখা করতে দেন, তার কথাও আমি বলছি না। এ হচ্ছে আসল টিকের ব্যবসা।'

'আসলটি কি ব্যক্ত করহ, বৎস!' আমি বললাম, 'বিস্তৃত বিবরণ সহ।'

'টিক হচ্ছে এরকমের কাঠ—বার্মামুলুকেই মেলে কেবল।'

'কাঠ! তাই কও! তা, আকাঠের মতন অমন টিক টিক করছিস কেন তখন থেকেই?' আমি বললাম।

'ঠিক ঠিকই বলছি।' বলল ভোলানাথ—'আর এটাও জানি যে তার থেকে দামী দামী আসবাবপত্র বানায়—টিক-উডের ফার্নিচারের দাম সবচেয়ে বেশি। টিকের জিনিস ঢের বেশি দিন টিকে থাকে বলেই ওই কাঠের নাম টিক হয়েছে কিনা তা আমি বলতে পারব না।'

'তা, তোর দাদুর টিকের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক তা তো সঠিক বুঝতে পারছি না, দাদা।' বলল শৈলেশ।

'দাদুর নিজের ছেলেপুলে বলতে কেউ নেই, আছে কেবল অঢেল টাকা। লোকটা কী ধরনের জানিস? সেই যে মারা গেলে কাগজে ছবি ছেপে বেরোয় আর লেখা থাকে—ওঁর ভারী দান-ধ্যান ছিল, যেমন পরোপকারী তেমনি দাতা, দেশহিতৈষী মহাপুরুষ, কত লোককে —কত পরিবারকে গোপনে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি!'

'সে তো মারা যাবার পর জানা যায়, জ্যান্ত থাকতে টের পায় না কেউ।' আমি প্রকাশ করি।

'এখানে জ্যান্ত থাকতেই জানা যাচ্ছে। জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত দাদু। তিনি চান বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে যাক—তিনি নিজে যেমনটি হয়েছেন। সেই জন্যে কেউ গিয়ে ব্যবসার জন্য তাঁর কাছে টাকা চাইলে তক্ষুণি তিনি মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন—এমনিতেই।'

'বলিস কী রে?'

'তবে আর বলছি কি। আমার এক মামাতো ভাই ব্যবসা করবে বলে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে এনেছে তাঁর কাছ থেকে।'

'কাঠের ব্যবসা?'

'না কাঠ নয়, কাটলেটের। বলছে যে বিক্রি না-হয় নিজেই খেয়ে কাটিয়ে দেবে সব, পয়সা দিয়ে তাকে আর কাটলেট কিনে খেতে হবে না। ব্যবসাটা মন্দ নয় তেমন।'

বলল ভোলানাথ।

সে বুঝি কাটলেট খায় খুব?' জানতে চায় শৈলেশ।

'করেছে নাকি কাটলেটের ব্যবসা?' সঙ্গে সঙ্গেই আমার সোৎসাহ প্রশ্ন।—'কোথায় তার সেই দোকানটা রে? ধারে খাব না হয় তার কাছে!'

'কাটলেট না কচু! সিনেমা দেখে ফুঁকে দিচ্ছে টাকাটা। কেবল রোজ চারটে করে দিলখোস কেবিনের কাটলেট কিনে নিজের দোকানের বলে পাঠিয়ে দেয় দাদুকে। দাদু ভারি খুশি। বলছে যে কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তার ব্র্যাঞ্চ খুলতে আরো আরো টাকা সাহায্য করবে তাকে।'

'ভারী কাটথ্রোট তো!' আমি বলি, 'না না, তোর দাদুকে বলছি না—তোর মাসতুতো ভাইটা।'

'মাসতুতো নয়, মামাতো ভাই। মাসতুতো বলে অপমান করছিস আমার?' ভোলানাথের ভারী গোসা হয়।—'মাসতুতো ভাই তো চোরে চোরেই হয়ে থাকে।'

'ওই হল। মাসীর গোঁফ বেরুলেই মামা।' আমি এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিই।

'তাহলে তুই যাচ্ছিস নে কেন?' শুধায় শৈলেশ: 'তুই গেলে তো অনেক বেশি টাকা পেতে পারিস। তোর নিজের দাদু বলছিস যখন।'

'না, আমি গেলে হবে না। আমি তার আপন খুড়তুতো মেয়ের আপন ছেলে যে, বলছি না যে লোকটা ভারি পরোপকারী। পরের উপকার করে, নিজের লোকের জন্য কিছু করে না। বলে যে, নিজের লোককে চান্স দিলে সেটা নাকি নেপোটিজম্ হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি সে পরস্মৈপদী নেপোদের দই মারতে দেয়?' আমি কই।

'তা হতে পারে।'

'নাকি, নাতিরা বৃহৎ হোক চায় না একদম?' আমি বলি, 'তাদের নাতিবৃহৎ থাকাটাই পছন্দ করে বোধহয়?'

'তাই হবে হয়তো। তাহলে তুই যা।' বাতলায় সে আমায়, 'তুই তো দাদুর কেউ নোস—যাকে বলে কাকস্য পরিবেদনা। তুই গেলে দেবে ঠিক।

'কিন্তু কী ব্যবসার কথা বলব বল তো?'

'যা মাথায় খেলে, যা মনে আসে তখন। ব্যবসার নাম শুনলেই দাদু অজ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। টাকা তো দেয়ই। খাওয়ায় আবার। খুব খাওয়ায়, বলল আমার মামাতো ভাই। কেউ কিছু খেলে খুব খুশি হয় নাকি। খুশি হয়ে টাকা দেয় তখন।'

'বলিস কী রে?' বলে জিভের ঝোল টানি, 'সে কথা বলতে হয় আগে।'

সেদিন বিকেলেই বেরিয়ে পড়লাম ভোলানাথের দাদুর দিশায়। ততটা টাকার লোভে নয়, যতটা ভালমন্দ চাখার লালসায়। সত্যি বলতে চম্‌চম্, ছানার গজা, ল্যাংচা, পান্তুয়া, লেডিকিনী, দরবেশ,

শোনপাপড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ, রাবড়ি—তারাই আমায় মুক্তরামের মুক্ত আরাম ছেড়ে অতদূর আহিরীটোলায় টেনে নিয়ে গেল কান ধরে হিড়হিড় করে? নাম্বার খুঁজে বাড়ি বার করতেও দেরি হল না বিশেষ।

বিরাট বাড়ি। অবারিত দ্বার। সোজা ওপরে উঠে গেলাম। দোতলার সামনের ঘরেই সৌম্যদর্শন বয়স্ক এক ভদ্রলোককে সোফায় বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে তিনি শুধালেন, 'কে তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি ভোলানাথের মামাতো ভাই।' জবাব দিলাম, 'আপনার নাতি শ্রীমান ভোলানাথ।'

'ও!...তা, ভোলানাথ তো ঠিক আমার আপন নাতি নয়। মানে, আমি বলছিলাম যে ঠিক আমার পৈতৃক নাতি নয় সে।'

'পৈতৃক নাতি।' আমার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরোয়। 'পৈতৃক সম্পত্তি হয়, আমি জানতাম। পৈতৃক নাতি হয় যে, তা আমার ধারণা ছিল না।'

'পৈতৃক নাতি, মানে, বাবা বিয়ে দিয়ে গেলে নিজের বৌয়ের মেয়ের পেটের ছেলে হলে যাকে বলা যায়। আমি তো বে-থা না করেই রেঙ্গুনে পালিয়ে গেছলাম যৌবনে ব্যবসা করতে। ভোলানাথ হচ্ছে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের শালীর ছেলে।'

'তাহলে অবিশ্যি তাকে সহোদর নাতি বলা যায় না সত্যি!' সায় দিতে হয় আমায়।

'তাই বলছিলাম তুমি ভোলানাথের কী রকমের মামাতো ভাই?'

'আমি...আমি...আমি'—আমতা আমতা করি। আমার আমিত্ব আমায় ছাপিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'সেদিন ভোলানাথের এক মামাতো ভাই এসেছিল কি না, রাখহরি—কী যেন নাম। বলল যে, সে-ই ভোলানাথের একমাত্র মামাতো ভাই, আবার তুমিও বলছ...'

'আজ্ঞে, একটু ভুল হয়েছে, শুধরে নিই আমি, নই, ভোলানাথই

হচ্ছে আমার মামাতো ভাই। গুলিয়ে ফেলেছিলাম আমি। মামায় পিসেয় মিলে মিশে গেছল···আমি হচ্ছি ওর পিসতুতো ভাই।'

'তাই বল!' শুনে তিনি ঠাণ্ডা হন—যেন মনের শান্তি খুঁজে পেলেন তিনি।

'তোমার নামটি কি?'

'আজ্ঞে, আমার নাম থাকহরি।'

মামাতো আর পিসতুতো দুই ভাইয়েরই নামের দুটো পিস মিলিয়ে আমি বিশ্বাসযোগ্য করে দিই। পরিবেশটা যাতে পিসফুল হয়।

'আশ্চর্য! আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বংশে দেখছি হরিনামের ছড়াছড়ি। তার নামও ছিল আবার রামহরি।' বলে তিনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন, 'দেদার হরির লেনদেন।···তা তুমি কি খেয়ে বেরিয়েছ বিকেলে?'

'আজ্ঞে···' বলে আমি চুপ করে থাকি। এ-কথার আর কী জবাব দেব? সত্যি বললে বলতে হয় যে এইখানে এসে বেশ করে সাঁটব বলে সেই সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি দিয়ে পড়ে আছি। ভোলানাথের কথাটা দেখছি মিথ্যে নয় নেহাত! ব্যবসার কথাটা না পাড়তেই তিনি খাবার কথাটা পেড়ে বসেছেন।

আহিরীটোলার বিখ্যাত সন্দেশের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছি। তিনি উঠে এসে আমার নাকের ডগা টিপে ধরলেন।

এ কী! খাবার নাম করে হঠাৎ আমার এই নাকমলা কেন? চমকে উঠতে হয়! এরপর কি আবার কানমলা খেতে হবে নাকি?

তারপর ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'ঠাণ্ডা!···দেখি, তোমার হাত দেখি।'

আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'হাতটাও ঠাণ্ডা দেখছি। ভাল কথা নয়।'

তারপর তিনি আমার পায়ে হাত দিতে এগুচ্ছেন দেখে আমি

তিন পা পিছিয়ে এলাম, 'একী! একী! করছেন কী! আমার বাপের বয়সী হয়ে আপনি আমার পায়ে হাত দেবেন—আমার পায়ের ধুলো নেবেন—সে কি কখনো হয়? আমি একটা পুঁচকে ছেলে বই তো নয়!'

'তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব কেন হে! আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা কিনা দেখছিলাম তাই।...দেখলাম যে একেবারে কিছুটি না খেয়ে রয়েছ! অনেকক্ষণ ধরে তোমার পেটে কিছু পড়েনি। চার-পাঁচ ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে রক্তের চাপ কমে যায় কি না! দেহের প্রান্তসীমাগুলো ঠাণ্ডা মেরে আসে, হাত-পায়ের আঙুল, ঠোঁট সব হিমশীতল হয়ে যায়। কিছু খেলেই ফের রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে তক্ষুনি সব গরম হয়ে ওঠে আবার। দাঁড়াও, তোমাকে আগে খেতে দিই এখন।'

বলে তিনি থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটা গেলাসে গরম জল ঢাললেন, তারপর একটা কৌটোর থেকে সাদা গুঁড়োর মতন কী একটা জিনিস ঢাউস চামচের বড় বড় চার চামচ গুললেন সেই জলে। গেলাসটা এগিয়ে বললেন—'নাও, এটার সদ্গতি কর। খেয়ে ফ্যালো চট করে।'

সুবোধ বালকের মতন ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম কোনরকমে।

'কী রকম খেতে?'

'বিচ্ছিরি! তেতো! আমার তো কোন অসুখ করেনি, ওষুধ খেতে দিলেন কেন আমায়?'

'ওষুধ নয়, এর নাম প্রোটিনেক্স। প্রোটিন কাকে বলে জান? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা এইসব হচ্ছে প্রোটিন। সেইসব প্রোটিনের সারভাগ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাশিত করে বিচূর্ণিত অবস্থায় এই কৌটোয় রক্ষিত। নেমন্তন্ন-বাড়ি গিয়ে মানুষ যত মাছ, মাংস, ডিম আর সন্দেশ সাঁটতে পারে, পুরো চার চামচে তুমি তার সারাংশটা সব খেলে এখন।'

'একটা পুরো ভোজ খেলাম। বলেন কি!' চোখের ওপর ভোজবাজি দেখে আমার তাক লেগে যায়।

'হুবহু। তবে জিনিষটা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই নিয়ম। কিন্তু দুধ এখন পাচ্ছি কোথায়? হরলিক্স দিয়ে খেলেও হত। আমার গোয়ালিনী মার্কা জমাট দুধের কৌটোও খালি, হরলিক্স নেই। তাই গরম জলে বানিয়ে দিলাম। তবে একটু চিনি মিশিয়ে দিলে হত হয়তো। নাও, হাঁ কর।' বলে এক চামচ চিনি আমার মুখগহ্বরে ঢেলে দিলেন তিনি।

'চিনি খেলে এনার্জি হয়। গ্লুকোজ খেলে আরো বেশি হয় অবিশ্যি। গ্লুকোজ হচ্ছে চিনির সাবস্টান্স। এইবার, ভিটামিন বড়ি খাওয়ানো যাক গোটাকতক। খাবার পরেই খেতে হয় ওগুলো। খালি-পেটে খাওয়া নিয়ম নয়।'

এরপর তিনি ছোট শিশির ভেতর থেকে লাল লাল দুটি কী যেন বের করলেন—'এ হচ্ছে অ্যাডক্সলিন। ভিটামিন এ আর ডি। এ খেলে চোখ ভাল থাকে। হাড়ের শক্তি বাড়ে। কব্জি মোটা হয়। দাঁত শক্ত হয়। নাও, খেয়ে ফ্যালো টুক করে।'

চিনি খাবার পর আমার এনার্জি হয়েছিল সত্যিই। আপত্তি করে বললাম, 'আমার চোখ এমনিতেই খুব ভাল। বেশ পড়তে পারি। দাঁতও বেজায় শক্ত আমার। কামড় দিয়ে দেখাতে পারতাম, কিন্তু আপনি গুরুজন……'

'এখন শক্ত আছে—বড় হলেই সব নড়-বড় করবে। কিন্তু তুমি যদি চিরদিন ভিটামিন এ আর ডি খেয়ে যাও তো বয়েস হলেও তোমার দাঁত কক্ষণো নড়বে না। এই ছাখো না, অষ্টাশী বছর বয়স, আমার দাঁত ছাখো।' বলে তিনি তাঁর দাঁতের দু-পাটিই বিকশিত করলেন।

তাঁর দন্তবিকাশ দেখেও আমার তেমন উৎসাহ হল না। বললাম, 'প্রোটিন তো খেলাম, আবার কেন? ওতেই হবে।'

'তা কি হয়? প্রোটিনে তো খালি মাংসপেশী গজায়। পেশীর তন্তুরা গড়ে ওঠে। হাড় কি তাতে হবার? হাড় হয় ক্যালসিয়ামে। যে-জিনিস ঐ ডি-ভিটামিন উৎপন্ন করে থাকে। আর এ-ভিটামিনে হয় চোখ তাজা। দুধে আছে ঐ দুই ভিটামিন। এক পিপে দুধ খেলে যতটা এ-ডি পাওয়া যায়, এর দুটি ক্যাপস্যুলে তুমি তাই পাবে। এই নাও, দেরি কোরো না, গিলে ফ্যালো চট্ করে। খাবারের সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ম বলে বড়ি দুটো একরকম জোর করে তিনি আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন।

'এবার হজম করার পালা শুনেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল, পালার জায়গায় আমি যেন ঠ্যালা শুনলাম। খাবার ঠ্যালার পরে এখন হজম করার ঠ্যালা! তাড়াতাড়ি বললাম—'ওষুধের কোন দরকার নেই আমার। এমনিতেই আমার বেশ হজম হয়।'

'বললেই হল—এমনিতে কিছুই হয় না। দাঁড়াও তোমায় হজম করাই। হজম করা কি সহজ ব্যাপার হে! এই যে বি-কমপ্লেক্সের বড়ি দেখছ—কমপ্লেক্স মানে একটা গ্রুপ, বি-ভিটামিনের সম্প্রদায়। এর ভেতর আছে একাধিক বি-ভিটামিন—বিভিন্ন কাজ এদের। বি-ওয়ান হচ্ছে বেরিবেরির ওষুধ। বাতও সারায় আবার।'

বাধা দিয়ে বলি, 'আমার বেরিবেরি হয় নি। বাত কক্ষনো হয় না!'

'হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বাত হলেই তোমায় চিৎ করে ফেলবে, বিছানা থেকে উঠতে দেবে না। তারপর আর কোন বাতচিৎ নেই, কাজেই তার আগেই······প্রিভেন্‌শন্ ইজ বেটার দ্যান কিওর··· বলে থাকে শোন নি? তারপর, বি-টু-থ্রি-ফোর—এদেরও নানান গুণাগুণ আছে, তার বিশদ ব্যাখ্যানের দরকার নেই, তবে তোমাদের এখন ছাত্রজীবন—বি-সিক্স—মানে, পাইরোডিক্সিন—এটা খাওয়া তোমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এতে মেমারি বাড়ায়। আর বি-টুয়েলভ্ হচ্ছে রক্তবর্ধক।'

রক্তের জন্য আমার কোন লালসা ছিল না, তবে মেমারিতে আমি বড্ডই কাঁচা—তাই একটু প্রলুব্ধ হয়ে হাত বাড়ালাম, 'দিন তাহলে, দুটো বড়ি দিন, খাই। কিংবা চারটেই দিন, মেমারিটা আমার চটপট বাড়াতে চাই।'

'বাঃ, এই তো বেশ! লক্ষ্মীছেলের মতন কথা। দুটো কেন, চারটেই নাও। এন্তার আছে। পুরো এক শিশিই নাহয় দিয়ে দেব তোমাকে।'

বি-ভিটামিন খাইয়ে তিনি বললেন—এবার সি-ভিটামিনটা খেলেই কমপ্লিট হয়ে যায়। এ-ডি আগেই খেয়েছ, বি-ও খেলে, এবার সি। ৫০০ মিলিগ্রামের এক বড়ি রোজ একটা খেলেই যথেষ্ট।'

চার রকমের বড়ি খেয়ে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল—তারপর ৫০০ মিলিগ্রামের সি-এ আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম আর তিনি বলে চললেন, 'আরো সব ভিটামিন রয়েছে, ই, কে ইত্যাদি—সে-সব খাবার তোমার দরকার নেই। প্রোটিন হল কার্বোহাইড্রেট, হয়েছে, এবার কিছু ফ্যাট। তাহলেই হয়ে যায়। তোমার খাওয়াটা পুরোপুরি হয়।' ফ্যাট বলে না, ফট্ করে দেরাজ থেকে তিনি একটা পেল্লায় বোতল বার করলেন—'এ হচ্ছে ফ্যাটের সেরা ফ্যাট। খাঁটি কডলিভার তেল।'

তিনি বলছিলেন, 'এই কডলিভারের তিন চামচ, আর তার সঙ্গে গ্রেন দুই কুইনিন—মিশিয়ে খেলেই, কডলিভার প্লাস কুইনিন—যেমন খাদ্য তেমন একটা বলকর টনিক। যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি জ্বরজারির প্রতিষেধক।'

টনিকের নাম শুনেই আমি টনকো হয়ে উঠলাম। কডলিভার! নামেই কেমন বিবমিষা জাগায়। ছোটবেলায় গিলতে হয়েছে খুব। শুনেই না, গা বমি বমি করতে লাগল আমার। পাছে ভোলানাথের দাদুর গায়েই বমি করে বসি—তাই সেই বমবিং-এর আগেই তিন লাফে সিঁড়ি পেরিয়ে ফুটপাথে নেমেই আমার ওয়াক!

সেই ওয়াক-এর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় প্রোটিন ভিটামিন ইত্যাদি এমন কি যে কডলিভার খাইনি কিংবা সেই শৈশবকালে খেয়েছিলাম তারও খানিকটা বেরিয়ে গেল।

তারপর সেখান থেকে সটান আমার ওয়াকিং শুরু। উঠলাম এসে সোজা ভোলানাথের আস্তানায়।

'এই তোর দাদু! এমনি সে খাওয়ায়? খাইয়ে খুশী হয় আবার? খুশী হয়ে টাকা দেয়? তোর দাদুর নিকুচি করেছে।'

আমি তাকে মারতে বাকি রাখি কেবল।

আগাগোড়া সব সে কান পেতে শোনে, তারপরে মাথা নাড়ে, 'রাখহরি কি মিছে বলেছে! মিথ্যে কথা বলার ছেলেই নয় সে। পাক্কা বিজনেসম্যান। সব ক'টা খাবার সে মুখ বুজে খেয়েছিল, প্রত্যেকটা আইটেম চেয়ে চেয়ে নিয়েছে ফের ফের। চেখে চেখে তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছে। কডলিভার প্রায় দশ চামচ গিলেছিল—বিশ গ্রেন কুইনিন তার ওপর। চামচটা অবধি চেটে-পুটে খেয়েছে। তবে না খুশী হয়েছে আমার দাদু! তখন না দিয়েছে টাকা! বলেছে যে, আবার এসে খাবে—যত খুশী—যত তোমার প্রাণ চায়। ফের ফের টাকা দেব তোমায়। আর তুই খেলিই না তো কী হবে। ভোজন করলে তারপরে তো দক্ষিণার কথা—তখন তো ভোজন-দক্ষিণা!' গজ-গজ করে ভোলানাথ গঞ্জনা দেয় আমাকেই।

সাত ॥

এই ঘটনাটাও আমার সেই কৈশোর পর্বের—সেই পর্বতের থেকেই আহরিত একটি শিলাখণ্ড···

এখন তার কী অবস্থা জানিনে, আমাদের কালে আমি যে সময়ে চাঁচলে (মালদা জেলার অন্তঃপাতী) থাকতাম, মহানন্দার ছিল মহা বিষণ্ণ চেহারা। সারাটা বছর জলের বেজায় মন্দা দেখা যেত, নিজের

শীর্ণ শরীরটি নিয়ে জায়গায়-জায়গায় ডোবা হয়ে দাঁড়াত—কোথাও কোথাও আবার একেবারে খটখটে। পা ডোবানোই যেত না।

চাঁচল বাজারের কাছে পুলের মতন একটা থাকলেও সে সময়ে তার হাঁটুজল আমরা হেঁটে পার হতেই ভালবাসতাম।

কিন্তু বর্ষাকালে কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠত, এমন কি একেকবার বন্যায় পারের সীমানাও ছাড়ত সে। সেই সময়ে সদরের সরকারী কর্মচারীরা, সাহেব-সুবোরা বিশেষ করে, বজরা চড়ে মহানন্দার বুকে দর্শন দিতেন—সেটা একরকমের বিলাসিতাই ছিল যেন তাঁদের কাছে।

সেই রকমের একটি দিবসে মহানন্দার তটে যে মহানন্দ ঘটেছিল, বিলকুল মাটি হয়ে যাওয়া সেই জমাটি দিনের ব্যাপারটা এখনো মনে রয়েছে আমার।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গাঁয়ে ছিলেন না, তাঁর ছেলে পতিতপাবনই চিঠিখানা খুলল।

'···সদর থেকে বড় দারোগা এবং সার্কেলবাবু যাচ্ছেন তোমাদের এলাকায়। সরকারী বজরায় জলপথে তাঁরা যাবেন, অতএব জলপথেই যেন সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি বা অসন্তোষের কারণ না ঘটে সেদিকে হুঁশিয়ার থেকো। তাঁরা যেন কিছু না মনে করেন বা করার কোনও ওজর না পান—সেদিকে নজর রাখবে।···

সদরস্থ ওদের কোন শুভার্থীর চিঠি।

চিঠি পড়ে পতিতপাবনের ভুরু কুঁচকে গেল।

—ভারী মুশকিলে পড়লাম তো! বাবা এখন কবে ফিরবেন কে জানে, ইদিকে আমি—! বলল সে। মানে, ওর যা যা বলবার ছিল তার কিছুই বলল না।—তার ওপরে তিনি বজরায় আসছেন আবার! বজ্রাহতের মতন মুখখানা করে বলল সে—কী মুশকিলে যে পড়লাম! বলে গুমরে উঠল আবার।

—মুশকিল কিসের? যেমনটি লিখেছে তেমন-তেমনিটি করলেই হবে।—আমি ওকে উৎসাহ দিই।

—জলপথে সংবর্ধনা কি করে যে করব আমি তো ভেবে পাচ্ছি নে। অনেক নৌকো জড়ো করে আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে আনতে হবে বোধহয়? কিন্তু অত নৌকোই বা আমি পাই কোথায় এখানে? তাছাড়া এখন এ গাঁয়ে কি অত নৌকো আছে নাকি?

পতিতকে দারুন দুশ্চিন্তায় নিপতিত দেখা যায়।

—আরে পাগল! জলপথের মানে কি তাই? মোটেই তা নয়। —আমি জানাই।

সবে প্রথম শ্রেণীতে পা দিলেও বাংলা ভাষায় আমি উত্তম পুরুষ —বাল্যকাল থেকেই। নামে জনার্দন না হলেও ভাব-গ্রহীতায় চিরদিনই আমি ওস্তাদ। দারোগার পথ আর আমাদের পথ কখনো এক হতে পারে না—সহপাঠীকে আমি বুঝিয়ে দিলাম। আমরা জেলে যাই আর ওরা জেলে যাওয়ায়। আমরা যখন ঠিক এক পথের পথিক নই, তখন আমাদের জলপথও নিশ্চয় আলাদা হবার কথা। জলের মর্ম প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিই ওকে।

আমার ভাবার্থ শুনে পতিতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল— ওব্ বাবা! এর মধ্যে এত রহস্য?…কিন্তু এও তো মুশকিল—হাঁ-কার বন্ধ করে সে বলে—ওসব এখন পাই কোথায় এখানে? এধারে কি ঐ সব চীজ মেলে নাকি কখনো?

—শহরে কাউকে পাঠিয়ে দাও না হয়, দু-এক বোতল নিয়ে আসুক গে।—আমি বাতলাই।

কে যাবে শহরে এখন? আর কখন ওরা এসে পড়বে তাই বা কে জানে।—অতঃপর এই দ্বিবিধ সমস্যা দেখা দিল।

—আমার কী? আমি মানে বলে দিয়েই খালাস। তোমরা যাতে মানে মানে প্রাণে প্রাণে রেহাই পাও তার পথ দেখিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। আমার কর্তব্য শেষ। তারপর করা না করা তোমার

ইচ্ছে। নিস্পৃহের মত আমার কথা। যে বস্তু অন্দরের পথে নিয়ে যাতায়াত করতেই লোকে ভয় খায়, পাছে বন্ধুত্বের খাতিরে তাই আনতে আমাকেই শহরের সদর পথে পা বাড়াতে হয়, তার গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।

—দাঁড়া, একটা আইডিয়া পেয়েছি।—সে বলে ওঠে—আগের বার যখন মামার বাড়ি গেছলাম না কলকাতায়···আমার মামাকে একটা জিনিস বানাতে দেখেছিলাম। তার নাম পাঞ্চ।

—হ্যাঁ, ট্রামগাড়িতে কলকাতার কণ্ডাক্টাররা করে থাকে, আমি জানি।—আমি ঘাড় নাড়ি—টিকিটের ওপরে করে।

—আরে, সে পাঞ্চ নয়, এ অন্য ধাঁচের। পাঁচ রকমের বোতল থেকে একটু একটু করে ঢেলে খুব নেড়ে চেড়ে বানাতে হয়। খেলে নাকি হাতে স্বর্গ। আমি খেয়ে দেখিনি, মানে, ফাঁক পাইনি চাখবার। মামাটা যা চালাক আর কঞ্জুষ, দেরাজে চাবি দিয়ে রাখত সব সময়।

—এখানে বলে গিয়ে এক রকমেরই পাওয়া যাচ্ছে না, সে পাঞ্চ এখানে হবে কি করে শুনি? ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমি অবাক হই।

—এখানে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই বানানো যাবে। প্রসেসটা আমার জানা আছে তো। দ্যাখ না কি করি!

খেজুরের রস হাঁড়িখানেক পাওয়া গেল, আর পতিত কোত্থেকে খানিকটা তাড়ি যোগাড় করে আনল। আমিও পেছুবার ছেলে নই, যতটা যুগপৎ পারি বিপৎকালে দোস্তকে সাহায্য করাই আমার দস্তুর। সুসময়ে যেসব বন্ধুর দেখা পাওয়া যায়, আর অসময়ে কেবল যাদের বন্ধুরতা দেখা দিতে থাকে তাদের অন্যথা বলেই চিরদিন নিজেকে আমি মনে করে এসেছি। অতএব আমার পিসেমশাই কী একটা টনিক খেতেন—যার শতকরা ত্রিশভাগ নিছক অ্যালকোহল বলে লেবেল মারা ছিল—তার থেকে বেশ কিছুটা আমি সরিয়ে নিয়ে এলাম।

এই ত্র্যহস্পর্শের ওপরে আবার সিদ্ধি এসে পড়ল। সিদ্ধিলাভের ফলে উমদা হয়ে পানীয়টা এতক্ষণে খাবার যোগ্য হয়েছে বলে আমার ধারণা হল। বলতে কি, দেখেই একটু নেশাই লাগল যেন।—চেখে দেখব নাকি একটু ?—লালায়িত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—না, না। এখন না। আগে অতিথি-সৎকার হোক, তারপরে যদি থাকে তো আমরা।—পতিতেরও লালসা দেখা দিলেও সে আত্মসংবরণ করতে জানে। মামার বাড়ি থেকে সেই শিক্ষা সে লাভ করে এসেছে।

কিন্তু এ যা হয়েছে, এমন দেবভোগ্য জিনিস, অতিথি সেবার পরে আমাদের দেবার মত কিছু থাকবে কিনা সন্দেহ। আমি খুঁত খুঁত করি।

—কিন্তু যাই বল, এ তোমার সেই পঞ্চরং তো আর হল না—খুঁত খুঁত করতে করতে একটা খুঁত ধরা পড়ে আমার কাছে—চারটে জিনিস পড়ল কেবল। তবে একে চতুরঙ্গ বলতে পার বটে। চতুর্বর্গ লাভের মতন তাও পাওয়া নেহাত কম নয়।

—এক্ষুনি একে পাঞ্চ বানিয়ে ফেলছি, দ্যাখ না।—এই বলে ওর বাবার লাল কালির বোতলটা ওর ভেতর বেবাক ফাঁক করে দিল সে। —এই নে তোর পঞ্চরং ! হয়েছে এবার ?

হয়নি বলা কঠিন। কেননা পঞ্চত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে পানীয়ের রং যা খুলেছিল, কী বলব ! এমনকি, নিজেকে আমি জলচর দারোগার মতই সতৃষ্ণ বোধ করতে লাগলাম।

প্রায় কুঁজোখানেক সংবর্ধনা তৈরি করে সোজা হয়ে বসলাম। ততক্ষণে দারোগাবাবুর বজরা পাড়ে এসে ভিড়েছে, পাহারাওলা এসে খবর দিল। কেবল দারোগাবাবুর মজুদ হওয়াই নয়, সেই একই বজরায় তার নিজেরও যে আমদানী সেই খবর জানাতেও সে কসুর করল না।

যাক, সংবর্ধনা যখন প্রস্তুত, তখন বজরাঘাতে আর ভয় কিসের ?

আমি আর পতিত নদীর দিকে দৌড়লাম। তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে আনতে হবে তো!

দারোগাবাবু ও সার্কেলবাবু আপাততঃ নামবেন না, বজরাতেই থাকবেন জানালেন। দারোগাবাবু আরো জানালেন যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, যদি একটুখানি পরিষ্কার—

আর জানাতে হল না। ওতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি পতিতকে চোখ ঠারলাম—যার সরলার্থ—কী রে! কী বলেছিলাম? প্রথম কথাই তেষ্টার কথা, দেখছিস তো এখন? ঠ্যালা বোঝ!

কিন্তু ঠ্যালা বোঝার কিছু ছিল না তাই রক্ষে। কুঁজো বোঝাই পরিষ্কার হয়ে রয়েছে, কেবল তাকে ঠেলে নিয়ে আনতেই যা দেরি! —এক্ষুনি আনছি, বলে দৌড় মারল পতিত।

—ছেলেটাকে বলে দেয়া হল না। আমার জন্যেও অমনি এক গ্লাস আনত।—সার্কেলবাবু বললেন। তাঁকেও বেশ তৃষ্ণার্ত দেখা গেল।

—আপনি ভাববেন না। ও কুঁজোভর্তি নিয়ে আসবে। আমি আশ্বাস দিই।

—শুধু জল আনলেই যথেষ্ট। আবার খাবার টাবার আনবার হাঙ্গমায় যেন না যায়।—দারোগাবাবু মন্তব্য করলেন।

বলতে না বলতে পতিত সেই কুঁজো ঘাড়ে (নিজে আরেক কুঁজো হয়ে) আর গোটা চারেক গেলাস হাতে এসে হাজির। সেই কুঁজো নিয়ে আমরা সবাই বজরার ভেতরে গিয়ে জড়ো হলাম। বেশ বড় গোছের বজরা। ভেতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা। শোবার, বসবার, নড়বার চড়বার কোন অসুবিধে নেই।

বড় বড় দু'গ্লাস টইটুম্বুর করে দেওয়া হল।

—একি! এ কী জিনিস? শরবৎ নাকি?—জিজ্ঞেস করলেন দারোগাবাবু।

পতিত তদুত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বলতে না দিয়ে

—আজ্ঞে হ্যাঁ শরবতই বটে স্যার। ও-ই বানিয়েছে। ওর মামার কাছে শেখা এক রকমের এসপেশাল শরবৎ।—পতিতকে চোখ টিপে বাধা দিয়ে আমিই সতুত্তর দিলাম—চোখ টেপার মানে হচ্ছে ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে চলতে হয়, ঘুরিয়ে বলতে হয়, বুঝলি রে হাঁদা?

পতিত আমার ইঙ্গিত বুঝল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

স্পেশাল শরবৎ? তাই নাকি? তা রং দেখলে তাই মনে হয় বটে। সার্কেল অফিসার সাগ্রহে গ্লাসটা তুললেন।

পাহারাওয়ালাও আড়াল থেকে একটা হাত বাড়াল। সেও তো জলপথেই এসেছে, তার বর্ধনাই বা আলাদা হবে কেন? সেটা কি নেহাত অসঙ্গত হবে না? তার বেলাতেও তো সম্যক্ হওয়া উচিত? তার লোটাতেও একটু ঢেলে দেওয়া হল।

বজরার মাঝি দুজনাও বেশ লোলুপ—আমাদেরও একটু পেসাদ দেবেন বাবু।

তাদেরকেও বাদ দেয়া যায় না। তাদের বদনাতেও বেশ খানিকটা দেওয়া হল। এখন আমাদের পালা। পতিত বলেছিল, অতিথি-সৎকার করে বাকী থাকলে—এবং সে বুদ্ধি করে দুটো গ্লাস বেশীই এনেছিল, নিঃসন্দেহে উক্ত বাহুল্য আমাদের নিজেদের জন্যেই। কুঁজোর ভেতর বাকী কিছু আছে কিনা আমি উঁকি মারলাম।

—বাঃ, ফাস-কেলাস! গেলাস ফাঁক করে বলে উঠলেন দারোগা।

—এমন শরবৎ এ জীবনে খাই নি। সার্কেলবাবুরও গেলাস খালি। এবং খালি সাধুবাদ।

—বঢ়িয়া চীজ। পাহারাওয়ালাও জানাতে দ্বিধা করল না—বড়ি বঢ়িয়া চীজ।

—তোমরাও একটু খাও। এত কষ্ট করে করেছ। দারোগা বললেন।

—হ্যাঁ, খাব বই কি স্যার! খাচ্ছি এই যে! আমি তাঁর সম্মতিতে সায় দিতে দেরি করি না।

পতিতও আরো চটপট দু-গ্লাস ভর্তি করে ফ্যালে—তার এবং আমার গো-গ্রাসের উপযুক্ত দু'-গ্লাস।

গ্লাস মুখে তুলতে গিয়ে দারোগার দিকে আমার নজর পড়ল। বজরার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। কি-রকম যেন ঋজুভাবে দণ্ডায়মান মনে হল। সাধারণতঃ মানুষ, বিশেষ করে দারোগা মানুষরা, ঐভাবে দাঁড়ায় না, দাঁড়িয়ে আরাম পায় না। আমার পিসেমশাইকে প্রাণায়ম করার কালে ওই ধরনে বসতে দেখেছি। ওতে প্রাণায়ম হতে পারে, কিন্তু প্রাণের আরাম হয় না। পরীক্ষা করে দেখা আমার। কিন্তু কোণঠাসা হয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ আবার কী প্রাণায়ম দারোগাবাবুর ?

দারোগাবাবুর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, একেবারে কাঠ। নট নড়ন চড়ন—নট কিছু। চক্ষু স্থির, কিন্তু দুই চোখ দিয়ে কী অনির্বচনীয় মধু বৃষ্টি হচ্ছে—এমন প্রাণ-কাড়া চাউনি সচরাচর দেখা যায় না—অন্ততঃ দারোগাদের তো নয়। আর তাঁর সারা মুখে যা অপার্থিব আহ্লাদ। পুলক যেন থৈ থৈ করছে !

সার্কেলবাবুর দিকে তাকালাম। তাঁরও তদ্‌গত ভাব, তথৈবচ অবস্থা। আত্মহারা হয়ে তিনি বসে পড়েছেন। এইটুকু তাঁর বাড়তি। আমার হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ল। পতিত মুখে তুলতে যাচ্ছিল, ঘুষি মেরে তার গেলাসটা আমি খসিয়ে দিলাম।

—কী সর্বনাশ! আমি আর্তনাদ করে উঠেছি, এতগুলো মানুষকে তুমি খুন করলে। দেখেছ ?

—দূর! তা কি হয় ? বলল পতিত, কিন্তু তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা।

—পাহারাওলাটার মুখের দিকে তাকাও। আরেক দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কিন্তু সত্যি বলতে, তার পানে তাকানো যায় না। মাঝিগুলোর হুঁশ নেই, বজরার মাঝেই তারা কাৎ! কেবল পাহারাওলাটাই তখনো

ঘুমুচ্ছে। বোধহয় ঐ পঞ্চ রংয়ের এক রং—সিদ্ধিটা একরকম রপ্ত ছিল বলেই এখনো কিছুটা জ্ঞান-গম্যি আছে ওর।

আনন্দে গদ গদ ভাব নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে আসছিল।

—তোমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে বোধ হয়। আমি বললাম।

পতিত নিরুত্তর—নিস্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে থাকে। আর একটুখানি এগিয়ে অভিন্ন দশা লাভ করে পাহারাওলাও বজরা নিল।

—একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করছে, পাহারাওলাটাকেও থাইয়ে দিয়ে। আমি বলি।—তা না হলে এতক্ষণে আমাদের হাতে হাত-কড়া পড়ে যেত। নদীর এধারটায় বড় একটা কেউ আসে না—সেটাও এক বাঁচোয়া। চলো, এবার ভালোয় ভালোয় সরে পড়ি। পালিয়ে যাই এখান থেকে।

আমার কথায় কান না দিয়ে পতিত দারোগাকে ধরে ঝাঁকুনি লাগায়—দারোগাবাবু! ও দারোগাবাবু!

বাতাহত কদলীকাণ্ডবৎ বলে একটা কথা আছে না? পতিতের বাত শুনে আর ঝাঁকুনি খেয়ে দারোগাবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে প্রায় সেই রকম করে পড়তে যাচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে আমি বাধা দিলাম—তাঁর আর সে কাণ্ড করা হল না। ধরে ফেলে ফের তাঁকে সেই বজরার গায়ে ঠেকনো দিয়ে রাখলাম। আর তিনি স্থির প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—তাঁর ভাব বিহ্বল প্রশান্ত আনন নিয়ে।

তারপর একে একে বাকিদেরকেও নেড়ে চেড়ে দেখা হল—কারো বেলা কোন ব্যতিক্রম নেই। হালের মাঝি থেকে পাহারাওলা পর্যন্ত সবার এক হাল। সবাই সমান নিস্পন্দ, সবার মুখেই সেই দেবদুর্লভ বোকা বোকা হাসি।

—তোর ঐ পাঞ্চের জন্যেই এই রকমটা হল। আমি বললাম।

পতিত কিছু বলল না, প্রত্যেকের বুকে কান পেতে শুনতে লাগল।

পাঞ্চের জন্য হল বটে, কিন্তু পাঞ্চের কোনটার জন্যে হল আমি ভাবি। ওর মধ্যেকার কতকাংশ দায়িত্ব আমার ছিল তো। সেই টনিকটার থেকেই এই টনিক এফেক্ট কিনা কে জানে। না কি, বোতলের সেই লাল কালিই শেষটায় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে? ভাবতে হয়।

—না না, প্রাণ আছে। বলল পতিত, ধুক ধুক করছে বুক। নিশ্বাস পড়ছে সবার, খুব আস্তে আস্তে যদিও—তবুও বেঁচে আছে সবাই।

—কিন্তু কতক্ষণ আর থাকবে সেই হচ্ছে কথা। আমি বলি, তোমার পাঞ্চের জন্যই হল তো।

—তোমার পাঞ্চজন্য-নিনাদ থামিয়ে কি করে এদের চৈতন্য ফেরানো যায় সেই চেষ্টা দেখবে একটু? ধমক দিল পতিত।

মহাপ্রস্থানোন্মুখ পাণ্ডবদের দিকে তাকালাম—যেন কয়েকটি মোমের পুতুল। প্রত্যেকের মুখে প্রসন্ন দিব্য ভাব। যেন এই জীবন আর পৃথিবীর প্রতি কারও কোন আসক্তি নেই। সবাইকে মার্জনা করে মার্জিত হয়ে সশরীরে স্বর্গলাভ করে বসে আছেন সবাই।

অজ্ঞানাচ্ছন্নকে চৈতন্যদানের যতগুলি পদ্ধতি জানা ছিল—গালে চড় মারা থেকে শুরু করে গা হাত পা টিপে দেওয়া তক—কিছু বাকী রইল না, এমন কি, একজন জলেডোবা লোককে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দানের যা কৌশল একদা দেখেছিলাম, তাও পরীক্ষা করতে কার্পণ্য করা হল না, কিন্তু সমস্তই বৃথা গেল।

শেষ পর্যন্ত পতিত দারোগার পায়ে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিলে আর কোন উপায় না দেখে। কিন্তু তথাপি তিনি মিষ্ট হাসি হাসতে লাগলেন।

—আর কোন উপায় নেই। ডাক্তার ডাকো এবার। আমি বাতলাই।

—হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকি আর সাধ করে গলায় ফাঁস পরি, মাইরি আর কি। বন্ধু ছাড়া এমন সদুপদেশ আর কে দেবে? পতিত আমার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকায়—কিন্তু ভাই, ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই, ভয় করে না একটুও, কিন্তু বাবা যে ফিরে এসে প্রথমেই একচোট ঠ্যাঙাবে সেই কথাই আমি ভাবছি—পতিতকে প্রায় কাঁদো-কাদো দেখা যায়।

—আচ্ছা, আমি বলি কি, বজরার তলায় ছ্যাঁদা করে বজরাসমেত ডুবিয়ে দিলে কেমন হয়? অবশ্যি, এখন নয়, এরা সব মারা গেলে তারপরে, মারা তো যাবেই। আমি ভরসা দিই।

—নদীর কুলে কখনো বজরা ডোবে? ডুবলেও মাথার দিকটা উঁচু হয়ে জেগে থাকবে। পতিত জানায়।

—আহা, এখানে কেন? নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে, আমি আবার সাঁতার জানিনে।

—আমি জানি। পতিত বলে এবং প্রস্তাবটা ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকিয়ে ছাখে—হ্যাঁ, তাহলে বোধ হয় মন্দ হয় না। এতক্ষণে একটা বন্ধুর মত উপদেশ দিয়েছিস্ বটে। হ্যাঁ, তাহলেই ব্যাপারটা বেবাক চুকে যায়—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। সাক্ষী-সাবুদ কিচ্ছু থাকে না। তুই সাঁতার জানিস্‌নে বলছিলিস্ না?

প্রস্তাবটার অসুবিধার দিকটা আরো ভাল করে আমার নজরে পড়ে এবার। কী জবাব দেব ভেবে পাইনে।

—ভয় খাস্‌নে তুই! আমি তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আমি তো সাঁতার জানি। পতিত অভয় দেয়।

ও যা আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে তা মা মহানন্দাই জানেন—আমারও আর জানতে বাকী থাকে না।

তখন আমাকে আর এক সদুপায় বার করতে ঘোরতরভাবে মাথা ঘামাতে হল।

—ওদের যদি কোন রকমে বমি করানো যায় তাহলে পেটের ওই সব বেরিয়ে গিয়ে বেহুঁশ অবস্থাটা কেটে যেতে পারে হয়তো।

—আমি বলি—ঘুরপাক খাওয়ালে হয় না?

কথাটা পতিতের প্রাণে লাগে। আর তক্ষুণি তক্ষুণি ও কাজে লেগে যায়। ছুটো বিছানার চাদর বজরার ছুদিকে খাটিয়ে সেই চাদরের চারটে খুঁট দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে লাগিয়ে ফ্যালে।

—এইবার দোলনার মত হল, হল না? কি বলিস্? এবার ওদের একে একে এতে চাপিয়ে খুব কষে ঘুরপাক খাওয়ান যাক। মনে হচ্ছে এতেই হবে। পতিত সমঝদারের মত মুখখানা বানায়।

—আগে দারোগা আর সার্কেলটাকে তোল—ওগুলোর ব্যবস্থা পরে—পতিত ওদের নামের সঙ্গে 'বাবুর' যোগ করা বাহুল্য বোধ করে; কাবু অবস্থায় স্বভাবতই তখন কারোর বাবুত্ব ছিল না।

দারোগা দাঁড়িয়েই ছিলেন—বোধহয় দোলনায় চাপার অপেক্ষাতেই। আমি আর পতিত ছু'জনে ধরাধরি করে তাঁকে দোলনায় তুলে শুইয়ে দিলাম। সার্কেলবাবু বজরার মেজেয় ততক্ষণে স্ট্রেট লাইন ধরে পড়েছিলেন। তাঁকেও ধরে তোলা হল।

—ব্যস, এবার দে ঘুরপাক—নাগরদোলায়।—এতক্ষণে পতিতের একটু উৎসাহ দেখা দেয়।

ঘণ্টাখানেক ধরে দোললীলা চলল। খানিকক্ষণ একে দোলাই, তারপর লাফিয়ে গিয়ে ওকে দোল দিতে হয়। দোলনার দাপটে গা আড়পাড় করে, আমার পেটে যা কিছু ছিল সব গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

—ফল দেখা দিয়েছে।—বলল পতিত। বেশ ফুর্তির সঙ্গেই বলল।

নবোত্তমে লাগা গেল আবার। আরেক ঘণ্টা ঘূর্ণীপাকের পরে এবার পতিত বমি করে বসল।

আমি কিছু বললাম না। শুধু চেয়ে দেখলাম।

—এতক্ষণে আমার সত্যই একটু আশা হচ্ছে।—পতিত নিজেই জানালে।

আমার কিন্তু আশাপ্রদ কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। দারোগার মুখের মিষ্টি হাসি অবিশ্যি মিলিয়ে এসেছিল, মাঝে মাঝে তিনি ভ্রূভঙ্গী করছিলেন এবং কেমন যেন একটা কাতরভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর আননে—কিন্তু হলে কি হবে, বমন করার কোন আগ্রহ সেখানে নেই। সার্কেলবাবুরও সে রকম লক্ষণ দেখা গেল।

চলল ঘুরপাক। খানিক পরে দারোগাবাবু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁকে নড়তে চড়তে দেখা গেল।

—এই! দেখছিস্ কি? চট করে এগুলো সরিয়ে ফ্যাল—পতিতকে ইশারা করতেই সে কুঁজো গেলাস—স্পেশাল শরবতের যা কিছু মাল-মশলা সব—নদীগর্ভে জলাঞ্জলি দিল। প্রমাণ কখনো রাখতে আছে? আর রাখলেও, দারোগার কাছাকাছি রাখা ঠিক নয় নিশ্চয়ই?

আস্তে আস্তে দারোগাবাবু অতিকষ্টে দোলনার মধ্যে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন।

—আমি…আমি কোথায়…আমার কী হয়েছে?—তাঁর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল তারপর।

—আপনার অসুখ করেছে স্যার।—উচ্চকণ্ঠে বললে পতিত।

—অসুখ? কী অসুখ করল?…আমি এরকম করে শুয়ে কেন? এভাবে আমাকে শোয়ালে কে? এ তো আমার বিছানা নয়।

—আজ্ঞে, জলপথে যে অসুখ করে থাকে সেই অসুখ। আমি জানালাম—যার নাম সী সিকনেস। সামুদ্রিক পীড়া—তাই হয়েছে আপনার।

—আর এরকম ব্যামো হলে যে রকম করে শোয়ানো নিয়ম সেই ভাবেই আপনাকে রাখা হয়েছে।—পতিত বলে দিল।

বজরার ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে মহানন্দাকে তাঁর মহাসমুদ্র বলে ভ্রম হল কিনা জানিনে, কিন্তু মেজেয় তাকিয়ে সামুদ্রিক পীড়ার যাবতীয় লক্ষণ চাক্ষুষ প্রমাণের ন্যায় চারিধারে ছড়াছড়ি দেখলেন এবং সেই দৃশ্য দেখে আবার তাঁকে বমি করতে হল।

তখন একেবারে নিজের সম্মুখেই—নিজের মুখ থেকেই হাতে-নাতে তিনি প্রমাণ পেলেন।

প্রমাণের সঙ্গে প্রমাণ যোগ করা, মিলিয়ে দেয়া এবং খাপ খাওয়ানো দারোগাদের চিরকেলে দস্তুর। বদ্ধমূল বদভ্যাস। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

॥ আট ॥

একদা আমি একবার গোটা কয়েক বাঘ, বাধ্য হয়ে, হ্যাঁ, শিকার করে বসেছিলাম। আমার বীরত্ব কাহিনী হলেও, অহমিকাবোধ না করেও আমি তা অস্বীকার করতে চাইনে···

মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড় বড় কেঁদো কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ঐ দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেছি। মেরেছি না বলে ধরেছি বলাটাই ঠিক।

মহারাজ বললেন—বাঘ শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে?

'না' বলতে পারলুম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্বচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধতে থাকে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে বসবে। তবু মহারাজার আমন্ত্রণ কী করে অস্বীকার করি? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে বললাম—চলুন, যাওয়া যাক। ক্ষতি কী?

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের বাঘের জন্য বিখ্যাত। এর পরে তিনি

কোথাকার মহারাজা তা বোধহয় না বললেও চলে। বলতে অবিশ্যি কোন বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেননা রাজা মহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম মহরম আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজারদর হয়ত একটু বাড়তই। কিন্তু মুশকিল এই, টের পেলে মহারাজা হয়ত আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবী আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না। মহারাজ না পড়ুন, মহারাজ-কুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে অভদ্র পাড়ায়, কোন মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে দেবে। অতএব সব দিক ভেবে স্থান কাল পাত্র চেপে যাওয়াই ভাল।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার যাত্রা তো বেরুলো। হাতীর ওপরে হাওদা চড়ানো, তার ওপরে বন্দুক হাতে শিকারীরা চড়াও—ডজন খানেক হাতা চার পায়ে মশ মশ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতীতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র মন্ত্রীদের হাতী। মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতীতে মশগুল হয়ে স্বয়ং মহারাজা, তারপরের হাতীটাতেই একমাত্র আমি, এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতি আরো গোটাকয়েক হাতী। তাতে অপাত্র অমিত্ররা। হাতীতে হাতীতে যাকে বলে ধুল পরিমাণ। এতো ধুলো উড়লো যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।

জঙ্গল ভেঙে চলেছি। পীচের রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ, এখন আর মশ মশ নয়, মড় মড় করে চলেছি। 'এই মর্মর ধ্বনি কেন জাগিলরে।'

—ভেবে না পেয়ে হত-চকিত শেয়াল, খরগোস, কাঠবেড়ালির দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখীদের কিচির মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে চলেছি। এগিয়ে

যাচ্ছি পীচের রাস্তা পেরিয়ে—পিছের দিকে না তাকিয়ে। আমরা বেপরোয়া। হাতীরাও কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোন বাঘের ধড় দূরে থাক, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতরে কিসের সোরগোল শোনা গেল। কোত্থেকে একদল বুনো জংলী লাফাতে লাফাতে ঘেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কী করছিল কে জানে। মহারাজা হয়ত বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করেই হাত্‌তী বলে চেঁচাতে লাগল।

হাত্‌তী তো কি? হাতী যে তা তো দেখতেই পাচ্ছো—হাতী কি কখনো দেখনি নাকি? ও নিয়ে অমন হৈ চৈ করবার কী আছে? হাতীর কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্পঝম্প আমার ভাল লাগে না। হাতীরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি? হাতীরও তো মানমর্যাদা আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে। মহারাজাকে কথাটা আমি বললাম। তিনি জানালেন যে আমাদের হাতীর বিষয়ে ওরা উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতী এদিকেই তাড়া করে আসছে, সেই কথাই ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে। এবং কথাটা খুব ভয়ের কথাই। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাতী এবং হাওদা-সমেত সবাইকে আমাদের দলে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে। তা নিয়ে লুচি ভাজবার জন্যও কেউ বাকী থাকবে না।

তৎক্ষণাৎ হাতীদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়া হল। কথায় বলে হস্তীযুথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক, কোনরকমে তো হাতীর পাল ঘুরল, তারপর এল পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতী চালিয়ে যাবার সময় মহারাজা বলে গেলেন—খবরদার, হাতীর থেকে একচুল যেন নোড় না। যত বিপদই আসুক, হাতীর পিঠে লেপটে থাকবে। দরকার হলে দাঁতে কামড়ে, বুঝেছো?

বুঝতে বিলম্ব হয় না। অদূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন হন করতে করতে এগিয়ে আসছে। হন্যে হয়ে পালাচ্ছে আমাদের হাতীরা। আর, সেই আওয়াজ আসছে। ক্রমেই আরো-আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতীরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতীটা কিন্তু চলতে পারে না। পদে পদে তার যেন কিসের বাধা। মহারাজার হাতী এতদূর এগিয়ে গেছে যে তার লেজটি পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতীরাও যেন ছুটতে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতীটার হল কী! সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোনরকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতীর পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরালো হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েছে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও সে-ই তখন দিশারী। একমাত্র ভরসা সে-ই আমাদের। আমার এবং এই হাতীর। জিজ্ঞেস করলাম—কী হে। তোমার হাতী চলচে না কেন? জোরসে চালাও। দেখছ কী?

—জোরে আর কী চালাবো হুজুর? তিন-পায়ে হাতী আর কত জোরে চলবে বলুন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে।

—তিন পা! তিন পা কেন? হাতীদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবিশ্যি, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার

পা দেখেই উঠেছিলাম বলে যেন মনে হচ্ছে। অবিশ্যি, ভাল করে ঠিক খেয়াল করি নি। তা ঠিক।

—এর একটা পা কাঠের যে! পেছনের পা-টা। খানায় পড়ে পা ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতীটাকে মারতে রাজী হলেন না, পেয়ারের হাতী তো। ঠিক রাজহস্তী যুবরাজ হাতী তো বটেই! সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রং বার্নিস যে ধরবার কিছু জো নাই। ইসট্রাপ দিয়ে বাঁধা কিনা!

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতীর পা-ই নয়, আমার গলাও সেই সঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া হাতীই নয় শুধু, দুগ্ধপোষ্য একটা ক্ষুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন। কাঠের হাতী নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কী করে চালাবে? আমি অবাক হয়ে যাই।

—বার্লি আমার নাম, সে সগর্বে জানাল—আর আমি হাতী চালাতে জানব না?

—বার্লি? ভারী অদ্ভুত নাম তো। আমার বিস্ময় লাগে। বার্লি তো জ্বরের পর চালাতে হয় জানতাম! হাতীর ওপর বার্লি কেন? হাতীটা কি তবে পেটরোগা নাকি? আমি ভাবি।

—আমি সাবুর ভাই। সাবু আমেরিকায় গেছে ছবি তুলতে।

—তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল। না বলে আমি পারলাম না। গেলে ভাল করতে।

শোনামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কিনা কে জানে, তৎক্ষণাৎ সে হাতীর ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশেই কিনা কে বলবে, দে ছুট! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া!

আমি আর আমার হাতী, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম। আর পেছন থেকে তেড়ে আসছে পাগলা হাতীর পাল।

দাঁতাল মাতাল যত হাতীরা এধারে। তেপায়া হাতীর পিঠে নিরুপায় এক হস্তীমূর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার মত আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছ-পালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধুলোর ঝড়। তার ঝাপটায় আমার দম আটকে যাবার মতন।

মহারাজার উপদেশমত আমি এক চুল নড়ি নি, হাতীর পিঠে লেপ্টে সেঁটে রইলাম। হাতীর পাল যেমন প্রলয় নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতীর পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল! নিচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কী দৃশ্য! লম্বা-চওড়া, বেঁটে-খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাৎ হয়ে শুয়ে! কর্তা, গিন্নী, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পুরো একটি ব্যাঘ্র পরিবার! হাতীর তাড়নায়, হয়ত বা তাদের পদাঘাতে, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোথাও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়। কিন্তু এই বিভূঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা আমার জানা নেই। তাছাড়া বাঘের চৈতন্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত কিনা সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কি, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটাকয়েক টেনে ছিঁড়ে বাঘগুলোকে একে একে পিঠমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটুলি বানিয়ে ফেলা হল—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতীটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য

করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে ধরে নিজের পিঠের ওপর চালান দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠলাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হল।

পাঁচ পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে একসঙ্গে এতগুলো শিকার—এ কি কম কথা? এ বীরত্ব কারো অস্বীকার করার নয়।

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্চা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন এতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারম্বার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না সে।

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হল। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত পা বাঁধা —নিতান্ত বাধা। নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লির মত একবার চোখ মুছে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করত।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষে যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলে অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—এতগুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কিছু নেই···বহুৎ তাজ্জব কী বাৎ বাবু সাব!

—আরে হাতিয়ার নেই, হাত ছিল তো? বাধা দিয়ে বলতে হল আমায়।

—আর তোমার হাতীর পা-ই তো ছিল হে। তাই কি কম

হাতিয়ার ? বাঘগুলোকে সামনে পাবামাত্রই, বন্দুক নেই, টন্দুক নেই, করি কী, হাতীর কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু-হাতে তাই দিয়েই এলোপাথাড়ি বসাতে লাগলাম। দমাদ্দম ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা! হাতীর পদাঘাত—কি কম ব্যাপার হে ? অবিশ্যি, তোমাদের হাতীকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বলবামাত্র পিছনের পা-দান করতে সে পেছ-পা হয় নি। তার পা-দানিতেই তো দাঁড়াতে পারলাম! আমিও আবার কাজ সেরে তেমনি করেই তার ইসট্র্যাপ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যি তুমি হাতীটার কেঠো পা-টার কথা বলেছিলে আমায়…!

অম্লানবদনে এত কথা বলে হাতীর দিকে চোখ তুলে চাইতে আমার লজ্জা করছিল। হাতীরা ভারি সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং হাতীদের মত সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্তি নয়, ও যেন রীতিমত অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে—কী বলব! বলা বাহুল্য, তারপর আর আমি ওর ত্রিসীমানায় যাই নি।

হাতীরা সহজে ভোলে না। কে না জানে ?

॥ নয় ॥

তমসার গর্ভ থেকে জ্যোতির উদ্গতি হোক, উপনিষদের এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের গানে রূপান্তরিত। 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো।' কিন্তু হায়, সে আলোও তো মিলিয়ে যায়, অন্ধকারেই নিমীলিত হয়। যথাকালেই। তবে হাঁ, যদি কোন জ্যোতির্ময়ী কখনো দয়া করে কারো মনের কষ্টিপাথরে আলোর দাগ কাটেন, কাজটা একটু কষ্টদায়ক হলেও সে দাগ চিরকালের।

মেয়েদের দাগা মিলায় না। মিলাবার নয়।

তমসো মা জ্যোতির্গময়। কিন্তু তমসার থেকে যেমন, তেমনি আবার তামাশার থেকেও কখনো কখনো আলো আসতে পারে। যেমন এসেছিল আমাদের অনিরুদ্ধর। অনেকদিনের নিরুদ্ধ আঁধার এক হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমলিয়ে এক মিনিটে সাফ হয়ে গেল।

আমার সঙ্গেই পড়ত তো এক কলেজেই। থাকতুম আমরা এক হোস্টেলে। অনিরুদ্ধ নিজের পড়া নিয়েই থাকত। বই মুখে করেই সারাক্ষণ।

আমরাও থাকতুম—ঐ পড়া নিয়েই। তবে আমরা ছিলাম আলাদা জাতের পড়ুয়া। ওর ছিল পড়ার দিকে টান। আর, আমাদের ছিল ঠিক তার উল্টো। টানের দিকে পড়া।

আমরা ছিলাম টোলের পড়ুয়া।

যা কিছু আমাদের টানত, সেই দিকেই আমরা টলে পড়তাম। ওর ছিল বই পড়া—রাতদিন বই আর বই। আমরাও পড়া বই জানতাম না। ও যে সময়ে উপনিষদের তত্ত্বে মশগুল, যমালয়ে গিয়ে নচিকেতার খবর নিচ্ছে, কিংবা যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌-এর সন্ধানে কাহিল, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় আধ-মরা, সেকালে আমরা ঐসব শ্লোকদের উত্যক্ত না করে, ওদের ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা করে দিয়ে শ্লোকোত্তর লোকের সিনেমা, কি কোন স্মার্ট সহপাঠিনী কিংবা আবার খাব সন্দেশ—এই জাতীয় নশ্বর বস্তুর প্রেরণায় যার পর নাই টলায়মান।

বলতে কি, এই একটু আগেই টলতে টলতে ফিরেছিলাম। টালটা আমার ওপর দিয়েই গেছল। রাণীর কাছে সিনেমার কথাটা পেড়েছিলাম আমিই।

আমাদের সেকসনে সবে ভর্তি হয়েছিল মেয়েটি। আর খালি, আমাদের ক্লাসরুমই নয়, আমাদের মনের বাসযোগ্য সব জায়গাই সে ভর্তি করেছিল—প্রথম ক্ষণটির থেকে। আমাদের অন্তর্ভূমি হয়ে

উঠেছিল রাণীর রাজধানী—অন্য কারো জন্য তার একটুখানিও ফাঁক ছিল না কোনখানে।

কিন্তু মেয়েটা ভারী কড়াপাকের। এক অনিরুদ্ধ ছাড়া আমাদের সকলেই গায়ে পড়ে ওর সাথে ভাব জমাতে গেছে—কিন্তু কোন হামলাকেই সে বড় একটা আমল দেয় নি। হাজার চেষ্টা-চরিত্তির করেও কাছ ঘেঁষতে পারে নি কেউ।

শেষটায়, তাকমাফিক একটু ফাঁক পেতে আমিই একটা চান্স নিলাম। সিনেমা, সুন্দর মেয়ে, আর আবার খাব, ধরতে গেলে, তিনটেই অতি অনিত্য বস্তু, মিথ্যে নয়, আলাদা আলাদা ধরলে তো কথাই নেই, কিন্তু ঐ তিনকে যদি কেউ একসাথে ধরতে পারে, মেলাতে পারে এক যোগসূত্রে, ভুলক্রমেও যদি এক ত্র্যহস্পর্শে এসে তারা মেলে কখনো, তাহলে তার চেয়ে অবিনশ্বর আর হয় না। তেমন উপাদেয় মুখরোচক আর কিছু নেই।

কিন্তু কথাটা পাড়তেই না, ফুঁ দিয়ে সে নিবিয়ে দিল এক নিশ্বাসে —'সিনেমা আমি দেখিনে। ছবি-টবি আবার দেখে নাকি মানুষ? ওই সব ন্যাকাপনা! আমার মোটেই ভাল লাগে না ওসব।'

'বিকেল বেলাটা তাহলে আপনি কাটান কী করে?'

'বই পড়ে। পড়ি বসে বসে। পড়ার চেয়ে আনন্দ কী আছে? যদি ওটা ভাল বই হয়,—তার চেয়ে···তার কাছে কি সিনেমা?' তারপর একটু থেমে সে যোগ করে: 'অবিশ্যি আজ বিকেলে আমরা এক জায়গায় যাব। আর্ট এগজিবিশনে।'

সিনেমার বইটাও যে ভাল ছিল, আনন্দদায়কই ছিল এবং সেখানে গেলে ভাল বই মন্দ হত না, এসব কথা মনের মধ্যে আমার গজ গজ করে উঠলেও, এ হেন গঞ্জনার পর, বাইরে গজাবার সাহস পেল না। সোজা নিজের হোস্টেলে ফিরে এলাম।

এসে দেখি, এখন—এমন গোধূলি-লগ্নে বারান্দায় বই হাতে অনিরুদ্ধ।

'এক মনে কী পড়ছ হে? কী বই ওটা? খুব মজাদার বুঝি?' আমি শুধাই।

'না, মজাদার বই নয়। সদ্ভাবশতক।' উত্তর আসে ওর। 'গুরুগম্ভীর শিক্ষাপ্রদ লেখা।'

'শিক্ষাপ্রদ? সদ্ভাবশতক? তাই নাকি? আলাপ জমাবার এক:শ্য রকমের আইডিয়া আছে বুঝি ওতে? আচ্ছা, কোন মেয়ে যদি মোটেই না কাউকে গায়ে মাখতে চায় তাহলে তার সঙ্গে ভাব জমাতে হলে কী কায়দায়—'

'মেয়েদের গায়ে মাখবার দরকার?' বলে সে আমার কথার মাঝখানেই এক প্রশ্নস্তূপ এনে খাড়া করে—'মেয়েরা কিছু সাবান নয় যে মাখতেই হবে—না মাখলেই নয়কো? কেন, তার প্রয়োজনটা কী শুনি, অ্যাঁ?'

গ্যাকার মত ওর অ্যাঁকার দেখে এমন রাগ হয় আমার। আরে মুখ্যু, প্রয়োজন ছাড়া কি প্রিয়জন বলে কিছু একটা নেই? যেটা একান্তই মাখামাখির জিনিস? ওজনের দিক দিয়ে হয়তো সমান হলেও, দুয়ের গোড়ার উপসর্গেই যে ফারাক, প্র···পরা···অপ···সম সবগুলো আমার মনেও নেই···, না থাক, তাহলেও একটার (যে স্বর্গের রূপ) সঙ্গে আরেকটার—যা নাকি বর্গের মতই সম্পর্ক, তা তো সোজাসুজি তাকালেই চোখে পড়ে।

'খালি খালি পড়ে পড়ে কী হয়?' আমি বলি—'পড়া কি কোন কাজে লাগে? বই পড়ে কি কখনো কারো বুদ্ধি পেকেছে? পাঠ জিনিসটা গোড়াগুড়িই কাঁচা, বুঝলে বাপু—' আমি ওকে পাট করতে লাগি—'বিলকুল জলে যাবার। যদি না সেই কাঁচা পাটকে পচিয়ে জল থেকে তুলে সূর্যের আলোয় শুকানো হয়, পাকানো হয়। সকল পাঠ পক্কদশা লাভ করে তখনই—যখন এই পাকানো কর্মটি কোন জ্যোতির্ময়ীর আঁচ পেয়ে—ছোঁয়াচ লেগে হয়ে থাকে।'

'জ্যোতিষ? হাঁ ভাল কথা। জ্যোতিষের কোন বই আছে নাকি তোমার কাছে?'

'জ্যোতিষের বই আমার কাছে থাকবে কেন শুনি?' আমি অবাক হই: 'ওর সঙ্গে আমার কী? আমি কি অমন ইতরের সঙ্গে কথা কই? আমাদের মধ্যে তো কবে থেকে আড়ি।'

'আহা, সে—সে জ্যোতিষ কেন গো? আমাদের কলেজমেট—তার কথা বলিনি—আমি বলছি, হিন্দু অ্যাষ্ট্রোলজির কোন বই কি আছে তোমার কাছে?'

'চেরোর পামিষ্ট্রি? না ভাই, ওসব চুলচেরা হাত দেখার ব্যাপারে আমি নেই। জ্যোতিষচর্চা রেখে চল এখন বেরুনো যাক। এই সন্ধ্যায় জ্যোতির্ময়ীদের সন্ধানে বেরুই। আর্ট এগজিবিশন খুলেছে নাকি আজ, চল গিয়ে দেখিগে। কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে সব দেখতে আসবে—আসবেই আলবাৎ।'

'মেয়ে! আবার মেয়ে?' অনিরুদ্ধ ঠোঁট ওলটায়: 'মেয়ের কথা তুলো না তুমি আমার কাছে। আবার আমি তোমায় বলছি, সাবানের মত না হলেও, বেশি যদি ওদের সঙ্গে মাখামাখি করেছ, দেখবে একদিন সাবানের মতই তোমায় ফর্সা করে দিয়েছে একদিন। একবিন্দুও তোমার বাকী নেই।'

সাফ কথায় আমায় এই অভিশাপ দিয়ে ও বেরুল। পা বাড়াল প্রদর্শনীর পথে। মেয়ে দেখতে নয়, ছবি দেখতে না—মেয়েদের ছবি কিংবা ছবির মত মেয়ে কোনটাই নয়—নেহাত আমার পাল্লায় পড়েই সে আমার সঙ্গ নিল।

প্রদর্শনীর প্রবেশপথে অজন্তার ত্রিভঙ্গিম নারীমূর্তির এক প্রতিচ্ছবি ছিল—তাই না দেখেই চমকে উঠল অনিরুদ্ধ—'আরে এ মেয়েটা এখানে এমন বেঁকে-চুরে দাঁড়িয়ে আছে কেন হে?'

'তোমাকে দেখবে বলেই বোধহয়।'

'এমন করে চেহারা ছরকুটে দাঁড়ায় নাকি মানুষ ? বিশেষ করে মেয়েমানুষ ! ছি ছি !' সে ধিক্কার দেয়।

অজন্তার শিল্প নিয়ে কেউ যে এমন জন্তুর মতন মন্তব্য করতে পারে আমি জানতুম না। পাছে কেউ শুনে ফেলে বেধড়ক মার লাগায় আমাদের, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ওকে টেনে নিয়ে তৈলচিত্রের কক্ষে গিয়ে পড়লাম।

'আরে, এরা যে আবার আরো সরেস। একেবারে উদোম সব। আরেক কাঠি সেরা দেখছি। পরনের কাপড়ও জোটে নি নাকি এদের —এই সব মেয়েদের ? অ্যাঁ ?'

'বোকার মত বোকো না। আর্ট ফর আর্টস সেক—এত বই পড়ছ আর এ কথাটা শেখোনি ? আট বছরের খোকারাও জানে যে ! আর্টিস্টরা ভগবানের সৃষ্ট পরম সুষমাকে ফোটাবে, না তোমার বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধুতি-শাড়ী আঁকতে যাবে ?'

'কেন, ধুতি-শাড়ী কি খারাপ নাকি ? চণ্ডীদাস পদাবলীর সেই— আহা ! চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি···আহা···' ভাবালুতায় ওর বাকরোধ হয়, চোখ বুজে আসে।

'আহা ! চলে Nill শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।' ···আমিও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠি। বলে, এই নীলিমা যে শাড়ির নয়, শূন্যতার, সেটা ওর কাছে পরিষ্কার করতে যাই, কিন্তু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শিল্পীদের দেয়ালা ওর চোখে পড়তেই আবার যেন ও উসকে ওঠে—

'—আরে রাম রাম ! আর্টের নামে এই বেআব্রু—এমন ধারা অভব্যতা অসহ্য। ছ্যা ছ্যা !' বলতে বলতে ওর চোখ-মুখ উৎসুক হয়ে ওঠে—আরো যেন উস্কানি পায় কোথা থেকে—'আরে আরে ! মিস মিত্রও এসেছেন যে ! ছাখো ছাখো—ঐ সামনের ঘরেই।'

দেখলাম। পাশের লোকচিত্রের ঘরটা অলৌকিক আলোয়

উদ্ভাসিত। আমাদের কলেজের রাণী আরেকজন সহপাঠিনীর সাথে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছেন।

'মিস মিত্র এমন সব ছবি দেখতে আসবেন তা ভাবাই যায় না। ও বলে: 'কিন্তু যাই বলো ও আর সব মেয়ের মত নয়। পড়াশোনার দিকে ওর ভারী ঝোঁক, তা জানো?'

'বেশ জানি।' শুষ্কস্বরে বলি। খবরটা যে আমার খানিক আগের জানা সে কথাটা আর ওকে জানাইনে।

'এই জন্যেই ওকে আমার এত ভালো লাগে। আমিও তো বই ভালবাসি। আর, এই জন্যেই আমার সঙ্গে ওর ভাব হয়েছে। খুব ভাব।...খুব ভাল মেয়ে।'

'তাই নাকি? কেমন ধারা ভাব শুনি একবার?' আমি বাঁকা চোখে তাকাই। চাল দেখানো ভাব যেমন ভালো নয় তেমনি ভাব দেখানো চালও আমি ভালবাসিনে।

'আমার কাছে পুরনো উপনিষদ-টিষদ আছে জেনে ও ভারী উৎসাহিত। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিল কিনা। ঋষি রবীন্দ্রনাথের আওতায় মানুষ। বৈদিক যুগের আবহাওয়ায়। আমার কাছে অনেক রেয়ার বই আছে ওকে বলেছি। দেখতে আসবে একদিন আমাদের হোস্টেলে—বলেছে আমায়।'

'বটে বটে? কবে তাহলে ওঁর পায়ের ধুলো পড়ছে আমাদের আস্তাবলে?'

'একটা দিন স্থির করলেই হয়। আমি ঠিক করেছি কালীসিংহীর মহাভারতটা ওকে প্রেজেন্ট দেব। ও-ই ওর মর্যাদা বুঝবে। ওর হাতেই মানায় ও-বই—কী বলো?'

'সেই বিরাট বইটা? পেল্লায় পাঁচমণি?' আমি শুধাই—'তা, ওকে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না আমি বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, ও বই তো কোথাও মেলে না আজকাল। পেলে ও খুব

খুশি হবে। দাঁড়াও, কাল রবিবার আছে, কালকেই মিস মিত্রকে আসতে বলি না কেন? কালই তো হতে পারে? কাল—'

বলেই ও আর দাঁড়ায় না। আমারই বঁধুয়া আমাকে ছেড়ে আমার আঙিনা দিয়ে ডিঙিয়ে আন্ ঘরে রওয়ানা দেয়।

আমি আনচান করি—কিন্তু ওকে আর এ-ঘরে আনা যায় না। যতই আকার ইঙ্গিত করি, ইশারা করি—তার কিন্তু কোন সাড়া নেই। ফিরেও তাকায় না এধারে।

এদিকে তো অ্যাতো ন্যাকামো—কী হবে মেয়েদের সাথে গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে? হেন তেন সাত-সতেরো। মেয়েরা কি সাবাং? সাবাং না হলেও তারা ফর্সা করবে। ফর্সা না করলেও গায়ে মাখবে —কত কথাই। কিন্তু বাপ, নিজে কী? নিজে কেন গায়ে পড়ে মাখামাখি করতে গেছ শুনি? মেয়েরা যে সাবান না হলেও সাবাড় করে তা কি তুমি জানো না? আর রাণীকেও বলি, যে লোকটা মেয়েদের সাথে মিশতে চায় না, ভালবাসে না আদপে, তাকে কেন অযাচিত এমন ভাবে গায়ে পড়তে দেওয়া···

'মিস্ মিত্রকে নেমন্তন্ন করে এলাম। কাল তিনটের সময়··· আমি গিয়ে ওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসব ওকে। ওই যা, কালীসিংহীর কথাটা তো বলা হল না। বইটা যে ওকে আমি প্রেজেন্ট দিতে চাই—একেবারেই বলতে ভুলে গেছি। দাঁড়াও, বলে আসি মিস্ মিত্রকে—দাঁড়াও।'

বলেই—আবার ও ফুরুৎ। পাশের ঘরে উধাও। কিন্তু ওর কথায় আমি আর দাঁড়াইনে। আমার বয়ে গেছে। সেই দণ্ডেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। মিস্ মিত্র আর মিত্র। মেয়েদের সঙ্গে মিশ খেতে যে নারাজ তার এই মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েসন কেন রে বাপু? এমন আমার বিচ্ছিরি লাগে যে কী বলব।

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে আসি। চলে যাই সটান এক পুরনো বইয়ের দোকানে। বেছে বেছে বই কিনি সেখান থেকে। বার্নার্ড শ'র,

বই না, ব্র্যাডশ'র রোলোয়ে গাইড। টেলিফোনের ডিরেক্টরী। পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঁজি। গুপ্তপ্রেস আর পি. এম. বাগচি। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ। কালীসিংহীর মহাভারত পাই না, কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লাদার আরেকটা পাওয়া যায়। শব্দকল্পদ্রুম। নগ্নদেহে বিলিতি মেয়েদের ব্যায়াম-লীলার বই পাই একখানা। সেই সঙ্গে বাৎসায়নের কামসূত্র—আর, আর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড, কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কালীসিংহীর মহাভারত মিলল না। অষ্টাদশ পর্বের এক পর্বও না। যাক, না পাই, আরেক পর্বত—শব্দকল্পদ্রুম তো মিলেছে। মানুষ খুন করার পক্ষে এও কিছু কম নয়। ও যদি কালীসিংহীর বই রাণীকে প্রেজেন্ট করে তাহলে আমি এই বিপুল শব্দব্রহ্ম—এই ব্রহ্মাণ্ডের এক ঘায়ে ওকে অ্যাব্‌সেণ্ট করে ছাড়ব। ওকে ধরাতল ছাড়া যদি না করি তবে—হ্যাঁ!

হোষ্টেলে ওর আর আমার মুখোমুখি ঘর। রবিবার আড়াইটা নাগাত ও বেরিয়ে যাবার পরই একটুক্ষণের জন্য আমি ওর ঘরে গেলাম। রাণীর অভ্যর্থনায় ঘরখানি কেমন সাজিয়ে রেখেছে—দেখতে গেলাম ওর অবর্তমানে। খানিকক্ষণের জন্যেই।

রাণীকে সঙ্গে করে হাসতে হাসতে ফিরল সে—ঠিক রাজার হালেই। ঢুকল গিয়ে নিজের ঘরে। ওদের ভাব পাতানো দেখতে লাগলাম আমি আড়ি পেতে। আধ-ভেজানো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

'আপনাকে যে বইটি দেব বলেছিলাম—এই সেই বই।' অনিরুদ্ধ বলে: 'বিখ্যাত কালীসিংহীর মহাভারত। আজকাল বাজারে মেলে না। এখনকার দিনে এত বড় বই কে ছাপবে?'

ডেকচেয়ারে রাণীকে বসিয়ে ডেস্‌কের দিকে সে এগোয়। কিন্তু ডেস্‌ক খালি। কালীসিংহ কোথায় গেলেন? বিছানার ওপাশের শেলফে রেখেছে নাকি ভুলে? কিন্তু সেলফ-হেলপ্ বলে একটা কথা

থাকলেও সেখান থেকে কোনই সাহায্য মেলে না। তবে কি চৌকির তলার বইয়ের গাঁদিতেই আছে? কিন্তু বিছানা ডিঙিয়ে সেখানে হাত না বাড়াতেই তার আঙুলে যেন বিছা না কামড়ায়।

'ওমা, একি! এ যে দেখছি বিরাট এক টাইম-টেবল! কার বই এ—অ্যাঁ? এখানে এল কি করে? এটা আবার কি? টেলিফোন ডিরেক্টরী দেখছি। কে রাখল এটা এখানে? ও বাবা —এসব কী আবার? যত রাজ্যের পাঁজি দেখছি যে! পি. এম. বাগচি—গু···গু···গুপ্তপ্রেস···'

কিন্তু গুপ্তের চেয়েও গূঢ় রহস্য ছিল আরো। রাণীর কাছেই সেই নিগূঢ়তা মুক্ত হল।—বইয়ের স্তুপাকারের সামনে চুপ করে বসে থাকা তার মতন পাঠলিপ্সুর কম্মো না।

বইয়ের গাদার কাছে সে এগিয়ে গেল—নিজের তাগাদায়। সাঁচি স্তূপের তলার থেকে টেনে তুলল একখানাকে।

বইটা হাতে নিয়েই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল; কপালে রেখা পড়ল। ভ্রূকুটির রেখা। ভাবান্তর দেখা গেল তার।

'এই সব বই আপনি পড়েন?' রাণীর কঠিন মুখ থেকে কঠিনতর বাণী বেরোয়।

'দেখি বইটা', অনিরুদ্ধ বইখানা হাতে নেয়—'বাৎসায়নের কা—কা—কা···এ যে বাৎসায়ন। অ্যাঁ, এ বই তো আমার নয়! কার বই?'

তার জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে রাণী বলে—'এই আপনার রেয়ার বই? ছি ছি···যত সব লো···ভালগার—অবসীন···বুঝেছি।'

অনিরুদ্ধর মুখের দিকে চাইতে পারে না রাণী। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সেদিকে চোখ ফেরাতেই আরেক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়। শুধু দেয়ালেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ কপালে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

দেয়ালের সারা গায়ে যেন ছবির দেওয়ালী! তন্বী শ্বেতাঙ্গিনীদের বিবস্ত্র দেহচর্চার চারুকলায় চর্চিত জায়গাটা।

রাণীর মুখ লাল হয়ে ওঠে—'এই সব দেখাতে আপনি ডেকে এনেছেন আমাকে?' সে যেন ফুলতে থাকে, এবং হয়তো ঠিক অনুরাগে নয়।

'নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল এখানে—আমার ঘরে আমি ছিলাম না যখন। সেই হতভাগাই এইসব কাণ্ড করে গেছে।' কৈফিয়তের সুরে বলতে যায় অনিরুদ্ধ।

'আর বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি সব···' বলতে বলতে রাণী চারগুণ ফুলে ওঠে।

তার এই অনিরুদ্ধ-রোষের ওপরেই আমি সেখানে গিয়ে পড়ি—'অনিরুদ্ধ, তোমার এই খাতাটা নাও। কিন্তু কলেজী নোটের খাতায় এসব কোটেশন কেন হে? যত সব লো···ভালগার···অবসীন—এ সব কী! দিনের বাণীর জায়গায় কী সব রাতের বাণী লিখে রেখেছ হে! আঁ···এ কে! মিস মিত্র না? তাই তো? কী সৌভাগ্য আমাদের, আপনি—আপনি এসেছেন আমাদের হোস্টেলে।'—

রাণী গুম হয়ে থাকে, জবাব দেয় না। মনে মনে গুমরোয় বোধহয়।

'কাল আপনি বইয়ের কথা বলছিলেন না? বই পড়া আমারো খুব বাতিক। বইয়ের আমি পোকা। পড়ার মজা সিনেমা দেখার চেয়ে একটুও কম নয়। বই যেমন মজায় তেমন আর কিছু না। বইয়ের মজা ঢের-ঢের বেশী। বিশেষ করে দুর্লভ বইয়ের আনন্দ তো আরো দুর্লভ। দু-চার খানা রেয়ার বই—দু-চার খানাই মাত্র—আছে আমার কাছে। যেমন ধরুন কেনোপনিষৎ—'

'কেন?'

'কেন যে, তা কে জানে। সেই তো প্রশ্ন। প্রশ্নোপনিষৎ ও রয়েছে আবার তার ওপর। তাই বা কেন, তাও আমি বলতে পারব না। যিনি উপনিষদ লিখেছেন তিনিই জানেন কেন।' এই বলে, কেন-র পরেও আরো যে 'প্রশ্ন' আছে এবং তা ছাড়াও, তারো ওপরে

'উপনিষদের' খটোমটো আরো কী সব যেন রয়েছে—কিছুই তার গোপন রাখি না।

উপনিষদের মহিমা অপার সত্যিই! আমার কঠোর কথাতে রাণীর মুখ মধুর হয়ে ওঠে—'কঠ? কঠও আছে আপনার কাছে? বলেন কি?'

'এ ছাড়াও আছে, অতি দুর্লভ আরেকটি বই। রাজতরঙ্গিণী। কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস।' আমি জানাই—'বইখানা আবার কহ্লনের লেখা। যা একখানা লিখেছে না! নিশ্চয় খুব বড়দরের লিখিয়ে—এই কহ্লন।'

রাজতরঙ্গিণীর উল্লেখে রাণী তরঙ্গিত হয়ে ওঠে—'কহ্লনের লেখা বিখ্যাত বই।'

'হ্যাঁ, বেশ মোটাসোটা বই। উপনিষদের মত চটি-চাপাটি নয়। এক ঘায় ঘায়েল করা যায় মানুষকে। আর হ্যাঁ, আরেকখানাও আছে আমার—পেল্লায় পাঁচমণী। বিরাট বই—বাজারে মেলে না কোথাও—অত বড় বই কে ছাপবে বলুন?'

'কী—কী—কী—কালীসিংহীর?'

'না, সিংহী নয়। সিংহীর মামা কোন ভোম্বলদাসের হবে হয়তো। কতদিন ধরে না খেয়ে লিখেছে কে জানে। একখানা কাণ্ডই। এমন প্রকাণ্ড যে, একজনের পক্ষে তুলতে পারা শক্ত—শব্দকল্পদ্রুম।'

এতগুলোর পরে···তার ওপরে···এই শেষ গুলিতেই সে খতম। এক তুড়ুমেই কাত!

'চলুন তো আপনার ঘরে। দেখি গে বইগুলো।' আমার ঘরে এসে রাণী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'এই পাঁচমণীখানা—যদি না কিছু মনে করেন, এখানা—আপনাকে উপহার দেবার অনুমতি পেলে আমি ধন্য হব।'

'খুব আনন্দের সঙ্গেই আমি নেব···' গদ-গদ ধ্বনি শোনা যায় ওর।

'না, এ বই আপনার হাতে তুলে দেব না আপনাকে খুন করার আমার অভিপ্রায় ইচ্ছে নেই। আমার চোখের সামনে আপনি উলটে পড়বেন তা দেখতে পারব না। ঠেলাগাড়ি করে এই লট—এর সবগুলো—বিলকুল আপনার বাড়ীতে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব একদিন।'

'বেশ, আজ বিকেলেই তবে।' সে উছলে ওঠে—'চায়ের নেমতন্ন রইল আপনার। আসবেন কিন্তু।'

তারপর অনেকদিন মুখ দেখিনি অনিরুদ্ধর। সময় পাইনি দেখবার। রাণী যদি কখনো কারো নিজের হয়, তখন তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে যাওয়াটা হয়রানি। দেখতে চাওয়াটাও অন্যায়।

তাছাড়া, এ মুখ দেখাবই বা কোন মুখে? জানি, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড...কিন্তু বন্ধুর হানিকে নিজের পক্ষে লাভ-জনক করাটা যেন কেমন! নেহাত প্রাণ নিয়ে টানাটান বলেই করতে হয়, করে থাকে মানুষ, নতুবা, এসব কর্তব্য যদি না করতে হত!...

মুখোমুখি ঘর করেও আড়ালে থেকে গেছি কি রকম। কিন্তু এ-রকম কি থাকা যায়? অবশেষে ওর সম্মুখে গেলাম একদিন—'ভাই, কিছু মনে করো না। তোমার কালিসিংহীটা ফেরত এনেছি, এই নাও।'

অনিরুদ্ধ বইয়ের ঢাকা থেকে মুখ বার করে—'ওঃ এনেছ? রাখ ঐখানে। না, কিছু মনে করিনি। কেনই বা করব বল? কোন ক্ষতি তো তুমি করনি আমার।'

'করি নি? তুমি বল কি?' গান্ধীবাদের এই সাক্ষাৎ অবতার আমায় হতবাক করে।

'না। বরং ঢের উপকার করেছ বলতে গেলে। এতদিন আমি

কী অন্ধকারেই না ছিলাম! আজে-বাজে যত পণ্ডিতি বই পড়তাম—তারই গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরেছি। ঘুরে মরেছি। তুমিই আমায় বার করলে তার থেকে। চোখ ফোটালে আমার।'

'অ্যাঁ?' বিস্ময়ে আমার চোখ ফাটলেও—মুখ ফোটে না।

'হ্যাঁ। তোমার এই পাঁজি-টাঁজিগুলো নিয়ে যাবে তো যাও। আমার কাজ নেই। এই ব্র্যাডশ'খানাও নিয়ে যাও তুমি। রেলের এই টাইম-টেবিলে কোনই কাজ নেই আমার। কিন্তু এ বইটি ভাই আমি ছাড়ছিনে—' হাতের বইটাকে ভাল করে হাতিয়ে সে বলে—'আসল জিনিস আছে ভাই এর মধ্যেই। জীবনের সত্যিকারের তত্ত্ব সব। তোমার এই বাৎসায়নেই।···বেড়ে বই!' সে বাৎলায়, 'আর তোমার ঐ ছবিগুলোও আমি ছাড়ব না। খাসা ছবি ভাই সব।'

অনিরুদ্ধ সেই বইয়ের ঢাকাতেই নিরুদ্ধ এখনো। তবে ঢাকার পুরানা পলটনে না—রম্‌নায়।

॥ দশ ॥

পেন্সিল নিয়ে সমস্যা দেখা দিল তারপর। কী করে ওগুলি বেচা যায়!

বেচারাম তো তৈরী—আমি, শৈলেশ আর ভোলানাথ তিন বেচারাই এক পায়ে খাড়া, কিন্তু কেনারাম মেলে কোথায়? কিনে যারা আরাম দেবে তারা কই? কুত্র?

'এই পেন্সিল নিয়ে কি সুবিধা করতে পারব আমরা?' বলতে গেলাম আমি—'যার গোড়াতেই এত পেন ···'

'ছাখো, পেন্‌স্ থেকেই শিলিং, শিলিং থেকেই পাউণ্ড। পেন্‌স্ জমে জমেই না? ব্যবসার আসল রহস্যটা তোমাদের বোঝাই···' বাণিজ্যের মূলতত্ত্বটা বোঝাতে এগিয়ে এল শৈলেশ—'একটা গল্প দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি সোজা করে।···'

গল্পের কথায় আমরা হাঁ করি, সন্দেশের বেলায় যেমনটা করেছিলাম।

'একদা কোন এক সময়ে'—শুরু করল শৈলেশ—'কোন এক দেশে দানশীল এক বদান্য রাজা ছিলেন। যে যা চায়, রাজা তাকে তাই দেন, কাকেও কখনো বিমুখ করেন না। সেই রাজার দরবারে একদিন একটা সাধু এল। এসে বলল—"মহারাজ কিছু দিন আমায়।"

'কী চাই আপনার?' শুধালেন মহারাজা—"ধনদৌলত, হাতি-ঘোড়া, গাড়ি-পালকি, অট্টালিকা না রাজপ্রাসাদ?"

"না-না, ওসব কিছু না। শুনুন আগে। দান গ্রহণের আগে আমার একটা আবেদন আছে। একটি শর্ত আছে আমার। একমাস, মানে পুরো বত্রিশ দিন ধরে দিতে হবে আমাকে। আজ যা দেবেন কাল আমি তার ডবল নেব। পরশু তার ডবল—এইভাবে। এইরকমটা একমাস ধরে চলবে। আজ আমার শুধু একটা নয়া পয়সা চাই।"

"ও, এই কথা! এ আর এমন কি।" বললেন রাজা—"আজ এক নয়া পয়সা, কাল দু নয়া পয়সা, পরশু চার নয়া পয়সা, তার পরদিন আট—এই তো? কত নেবেন নিন না।"

রাজা তাকে একটা নয়া পয়সা দিয়ে বিদেয় দিলেন। সাধু মহারাজ তার পরদিন এসে আবার দুটো নয়া পয়সা নিয়ে গেল। তারপর এই রকম করে ত্রিশ দিনে দানের পরিমাণ কত দাঁড়াল জান?' জিজ্ঞাসা করল শৈলেশ।

'কত আর?' আমি বললাম। 'এক গাদা নয়া পয়সার ঝুড়ি।'

'তা নয় বৎস! কোটি টাকার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। লক্ষ কোটি টাকার ওপর।' বলল শৈলেশ—'দান মেটাতে গিয়ে সব দিয়ে থুয়ে পথের ভিখিরি হয়ে যেতে হল সেই রাজাকে।'

'দূর! তা কি হয়!' ভোলানাথ ঘাড় নাড়ে।

'যোগ করে ছ্যাখ না। তাহলেই টের পাবে।' বলে সে ছক কাটল একটা—

১ম	দিন	১	নয়া পয়সা
২য়	”	২	”
৩য়	”	৪	”
৪র্থ	”	৮	”
৫ম	”	১৬	”
৬ষ্ঠ	”	৩২	”
৭ম	”	৬৪	”
৮ম	”	১·২৮	”
৯ম	”	২·৫৬	”
১০ম	”	৫·১২	”

'দশ দিনেই দাঁড়িয়ে গেল পাঁচ টাকা বারো নয়া পয়সা।' হাঁফ ছাড়ল শৈলেশ—'এগুলো আবার যোগ করতে হবে।' বলে শৈলেশ দ্বিতীয় কিস্তির অঙ্ক ফাঁদল।

'সেটা এর ওপরে আরেকটু বাড়াবাড়ি হবে, এই তো?' আমি যোগ করি।

'সেই হিসেবে কুড়ি দিনের দিন দানের পরিমাণ দাঁড়াল পাঁচ হাজার দুশো বিয়াল্লিশ টাকা অষ্টাশি নয়া পয়সা!'

'হ্যাঃ! এই টাকা দিতেই ফতুর হয়ে যাবে রাজা!' বিজ্ঞের মতন হাসি সামলাই—'রাজারা কি তোমার আমার মতন ফোতো কাপ্তেন?'

'আহা, এগুলো সব আবার যোগ হবে না? দাঁড়াও, নয়া পয়সা-গুলো সব ছেঁটে দিই, হিসেব করার সুবিধে হবে। খুচরো টাকাটাও বাদ যাক! রইল তাহলে মোট পাঁচ হাজার। তারপর—' শৈলেশ তৃতীয় দফা তার আঁকের ফাঁদ পাতল—

২১ দিনের দিন	১০ হাজার
২২ ”	২০ ”
২৩ ”	৪০ ”
২৪ ”	৮০ ”
২৫ ”	১৬০ ”
২৬ ”	৩২০ ”
২৭ ”	৬৪০ ”
২৮ ”	১২৮০ ”
২৯ ”	২৫৬০ ”
৩০ ”	৫১২০ ”

'ত্রিশ দিনের দিন দানটা দাঁড়াল একান্ন লক্ষ বিশ হাজার।' বলল শৈলেশ।

আমি বললাম—'ওরো বাব্বাঃ!'

ভোলানাথ বলল—'ওরে সাবাস!

শৈলেশ বলল—'তারপর আরো ছুটো দিন বাকি রইল। এক নয়া পয়সার জের কদ্দুর টের পাবে তাহলে।'

আমি বললাম—'জেরবার হয়ে আর কাজ নেই আমাদের।'

'তখনকার কালে নয়া পয়সা ছিল না কিন্তু। ভোলানাথ একটা খুঁৎ ধরে।

'একশো পয়সায় টাকা না হয়ে চৌষট্টি পয়সায় টাকা হত।' আমিও খুঁৎ খুঁৎ করি।

'তাহলে পনেরো দিনেই টাকার এই অঙ্কটা দাঁড়াত, বাকী সতেরো দিনে শ্রাদ্ধ আরো কদ্দূর দাঁড়াত, ভেবে দ্যাখো।'

'পরের টাকা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমার ভাল্লাগে না।' আমি জানাই।

'এই হিসেবে ছুকোটি আটচল্লিশ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।' বলল শৈলেশ—'তারপর এক নয়া পয়সা থেকে একত্রিশ দিনকার সব ধরে

সমস্ত যোগ করতে হবে বিল্‌কুল। সে সব যোগ কর এবার তোমরা।'

'যোগ করা আমার কম্ম নয়। ভারী শক্ত ব্যাপার ঐ যোগ', আমার জবাব।

'তার ওপরে যদ্দুর মনে হচ্ছে, এটা তোমার রাজযোগ।'

'শক্ত তো বটেই। কিন্তু সাধুকে তো হিসেবমত সব বুঝে নিতে হয়েছিল।'

'নিক গে। তার হিসেব সে বুঝবে, অত বোঝাপড়ার ভেতর আমি যাব কেন, জিজ্ঞেস করি? ও টাকাটার এক পয়সাও কি আমি পেয়েছি?' ভোলানাথ জানতে চায়।

'বারে! তা কি হয়? মোট কত এল জানতে হবে না আমাদের? নইলে ব্যবসার রহস্যটা বুঝব কী করে? ব্যবসা করতে নেমেছি যখন।' বলে শৈলেশ দায়টা আমার ঘাড়ে চাপায় যোগ করতে পারছ না? সামান্য ক'টা টাকা তো…'

'যোগ করতে ব্যায়াম হয় রীতিমতন। ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। 'যোগ ব্যায়াম আমার আসে না ভাই। আমি মনোতোষ রায় নই। আমায় ছেড়ে দাও।' আমি সকাতরে জানাই।

'তা কি হয়?' শৈলেশ তবু গোঁ ধরে থাকে।

'তাহলে তুমিই কর যোগ।' আমি ওকেই চেপে ধরি—'তোমার গুণ পণা যখন দেখিয়েছ, তোমার যৌগিক প্রক্রিয়াটাও দেখাও এবার।'

'তাহলে থাকগে যোগ ফোগ। ধরে নাও কোটি কোটি টাকা। এখন…'

'এখন এই টাকাটা দিচ্ছে কে আমাদের শুনি?' শৈলেশের কথায় বাধা দিয়ে আমি বলি—'কার কাছে গিয়ে হাত পাতব—আজ এক পয়সা দাও, কাল দু-পয়সা দাও, পরশুদিন তার ডবল——এমনি করে ত্রিশ দিন ধরে চুপিয়ে চুপিয়ে কাটব কাকে? কোন্

মহাত্মাকে? ব্যবসার রহস্যটা আমি বেশ ভাল বুঝেছি। এখন কার কাছে যেতে হবে বল? এমন কেউ এই ভূভারতে এহেন ঘোর কলিকালে কি আছে এখনো? ধরো, বরোদায় কি গায়কোয়ারে?'

'যিনি বরোদা তিনিই গায়কোয়ার। দুটো আলাদা নয়।' বাংলায় ভোলানাথ—'কথাটা হচ্ছে গায়কোয়ার অফ্ বরোদা।'

'বড়োদা, সেজদা, ছোটদা সবার কাছে যেতে রাজী আছি। কিন্তু তেমন ব্যক্তি অঙ্গে বঙ্গে কোথায় পাব শুনি?' আমার পুনরুক্তি: তেমন সোনাদা এখন কোথাও আছে বলে আমার শোনা নেই।'

'অঙ্গ বলে কোন রাজ্যই নেই।' ভোলানাথের আবার রসভঙ্গ।

'নেপালে কিংবা কাঠমুণ্ডুতে?'

'নেপাল আর কাঠমুণ্ডু এক জায়গায়।' ভোলানাথের আবার ভ্রম-সংশোধন—কাঠমুণ্ডু হচ্ছে নেপালের রাজধানী।'

আমি তার বাধা মানি না—'তাহলে এমন লোক কি কোথাও নেই এখন আর? ভুপালে কি রাজ্যপালে?'

'রাজ্যপাল কোন জায়গাই নয় মশাই।' ভোলানাথ শোধরায় আবার—'রাজ্যপাল বলে আমাদের আজকালকার লাটসাহেবকে।'

'তোমার মুণ্ডু।' বলে কাঠ হয়ে আমি নিজের মাথা চুলকাই।

শৈলেশ বলে—'ভিক্ষে করে নয়, ব্যবসা করে এই টাকা উপায় করতে হবে। ব্যবসা করলেই টাকা হয়। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

'অর্থাৎ? যথা?'

'হেনরি ফোর্ড কী করে কোটি কোটি টাকার মালিক হল? মোটর বেচেই তো? আজ একটা মোটর বেচল। কাল দুটো, পরশু চারটা—এই করে তার মোটর বেচবার হার বাড়িয়ে চলল। সামান্য লাভ রেখে মোটরের দাম নামমাত্র করে ছাড়ল—ফোর্ড গাড়ির চেয়ে সস্তা গাড়ি আর হয় না—কিন্তু তাতে হার হল না তার। বিক্রির হার বেড়ে গিয়ে জিত হল শেষ পর্যন্ত।'

'কিন্তু কোথায় পাব আমরা মোটরগাড়ি? তা বানাতে তো কারখানা লাগে...'

'শনৈঃ শনৈঃ, বৎস! শনৈঃ শনৈঃ! এই পেন্সিল দিয়েই শুরু হোক না আমাদের। আজ একটা পেন্সিল বেচলাম, কাল দুটো। পরশু চারটা বেচা হল...এই করে...এমনি করে ত্রিশ দিনে না হোক ত্রিশ মাসে তো আমরা লক্ষপতি হতে পারব।'

'সহস্রপতি হলেই বা ক্ষতি কি?' ভোলানাথ বলে।

'শতপতি হলেই বর্তে যাই ভাই।' আমি জানাই—'সেই সন্দেশখুড়োকে দিয়ে শ-খানেক টাকার সন্দেশ বানিয়ে খাই। একশো দিন ধরে।'

তার পরদিন তুমুল উদ্যমে তিনজনেই পেন্সিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিনদিকে।

রাস্তায় নেমেই আমি একটা ছেলেকে ধরলাম—'পেন্সিল নেবে ভাই? বেশ ভাল পেন্সিল।'

'অমনি দেবে? দাও না!' বলে হাত বাড়াল ছেলেটা।

'না, অমনি কি হয়। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।'

'পয়সা নেইকো আমার।' বলে চলে গেল সে।

তারপরে যাকে পাকড়ালাম সে বলল—'পেন্সিল আমায় কিনতে হয় না দাদা! বাবা অফিস থেকে নিয়ে আসে। দামী দামী পেন্সিল তুমি চাও তো তোমায় দিতে পারি একটা।'

তৃতীয় ছেলেটি বই বগলে ইস্কুলে যাচ্ছিল। তার কাছে গোড়াতেই কেনার কথা না কয়ে একটু ঘোরা পথে গেলাম।

'পেন্সিল আছে তোমার কাছে?'

'না তো। পেন্সিল নিয়ে কী করবে?' সে-ই আমাকে শুধায়।

'না, কিছু করব না। স্কুলে যাচ্ছ, সঙ্গে পেন্সিল নেই! লেখা-পড়ার কাজ তো! লিখবে কিসে?'

'কেন, পাশের ছেলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে। তার খাতা থেকেই সব টুকব তো।'

শুনে চমকে গেলাম। বেশ চৌকস ছেলে ইনি—ধারে কাটেন।

অবশেষে একটা খোকাকে বাগালাম—'খুব ভাল পেন্সিল আছে ভাই। সস্তায় দেব। কিনবে একটা?'

'পেন্সিল আমার চাইনে। ফাউন্টেন পেন আছে আমার।' বলে ছ-আনা দামের একটা খেলো ফাউন্টেন পেন বুক ফুলিয়ে সে বুকপকেট থেকে বার করে দেখাল।

এবার পঞ্চম ব্যক্তিকে পাকড়ালাম, কোন বালক নয়, ভদ্রলোক।

'পেন্সিল কিনবেন মশাই?'

'কী রকম পেন্সিল দেখি।'

আশান্বিত হয়ে দিলাম তাঁর হাতে একটা।

'না, এ-পেন্সিল তেমন মজবুত হবে না। আমি হার্ড পেন্সিল খুঁজছিলাম।

'বেশ হার্ড। দেখুন না, এর গায়ে HB মার্কা রয়েছে।'

'বলছ মজবুত? দেখি কেমন মজবুত! ধরো তো, এর ছুটো ধার—এমনি করে ধরো।'

তাঁর উপদেশমত আমি পেন্সিলের প্রান্ত ছুটি ছুই মুঠোর মধ্যে নিলাম।

'তুমি বলছ মজবুত? এই দ্যাখ, এর মাঝখানে আমার এই আঙুলের বাড়ি মারছি···আমার এই সামান্য আঙুল···'বলে মারতে না মারতেই সাধের পেন্সিল আমার একেবারে ছু-আধখানা।

'এবার আমি ধরছি ঐ ভাবে। তুমি মারো এবার···'

উনি ধরলেন, আমি মারলাম। আমার অঙ্গে তো নামমাত্র জোর, অঙ্গুলিতে কত কম হবে আরো। আশ্চর্য, তার জোরেই পেন্সিল একেবারে মটাৎ।

'আবার ধরো তুমি। এবার আমার এই কড়ে আঙুল দিয়ে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার পেন্সিল কেমন মজবুত!'

আমি তাঁর কড়ে আঙুলের ধার দিয়েও গেলাম না, আমার পেন্সিলগুলি নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে পড়লাম তক্ষুনি।

এইভাবে পাঁচ জনের ধাক্কাকাটাবার পর আর ছ-নম্বর খদ্দের পাকড়াতে আমি এগোই না। আমার পেন্সিলের ব্যবসা ওই খানেই নয়-ছয় হয়ে যায়।

আশা ছিল, সারাদিনে অন্ততঃ দু-চারটি পেন্সিল বেচতে পারব। আর তা পারলেও সন্দেশ না হোক, ডালমুট চানাচুর কিছু একটা এই গালে পড়বে। কিন্তু সামান্য চীনেবাদামের নাগালেও পৌঁছতে পারলাম না।

সন্ধ্যাবেলায় শুষ্কমুখে বাসায় ফিরে আর দুই মক্কেলের দেখা মিলল।

'কী হে! কী রকম বেচলে তোমরা? কেমন পেন্সিল বিক্রি হল তোমাদের?'

'একটাও না।' বলল ভোলানাথ। শুকনো মুখ।

'কিনতেই চাইছে না কেউ।' বলল শৈলেশ—'তোমার কেমন কাটল শুনি?'

'দুটো কাটিয়েছি।' আমি জানালাম—'আরো কাটানো যেত, কিন্তু তার আগেই পালিয়ে এসেছি আমি।'

পেন্সিলের ভগ্নাংশগুলি দেখালাম তাদের-'এই আমার কাটানো। কাটানো বা ফাটানো—যা-ই বল।'

ভোলানাথ শৈলেশকে শুধোয় হঠাৎ—'আচ্ছা, কাল যে ছেলেটা পেন্সিল গছিয়ে সন্দেশ কিনল তোমার কাছে, সে তোমায় কী বলেছিল বল তো

'এমন কিছু বলেনি। শুধু বলল—সন্দেশ বেচবে ভাই? আমি ঘাড় নাড়তেই সে বলল আগে গোটা আষ্টেক দাও তো। আমি

দিলাম। দিতেই না সে টপাটপ সেগুলি গালে পুরে দিল। গিলে ফেলল সবগুলি। তারপর বলল যে দিন চারেক কিছুই খায়নি সে।'

'কেন, খায়নি কেন?'

'কী করে খাবে? গত আট দিনেও একটা পেন্সিল বেচতে পারেনি তো।'

